উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়

দূরশিক্ষা অধিকার

স্নাতকোত্তর বাংলা পর্যায়

তৃতীয় সেমেস্টার

সফট পত্র(আবশ্যিক) ৩০৩

বাংলা ছোটগল্প

পর্যায় – খ

UNIVERSITY OF NORTH BENGAL

Postal Address:
The Registrar,
University of North Bengal,
Raja Rammohunpur,
P.O.-N.B.U., Dist-Darjeeling,
West Bengal, Pin-734013,
India.
Phone: (O) +91 0353-2776331/2699008
Fax: (0353) 2776313, 2699001
Email: regnbu@sancharnet.in ; regnbu@nbu.ac.in
Wesbsite: www.nbu.ac.in

First Published in 2019

All rights reserved. No Part of this book may be reproduced or transmitted, in any form or by any means, without permission in writing from University of North Bengal. Any person who does any unauthorised act in relation to this book may be liable to criminal prosecution and civil claims for damages.

This book is meant for educational and learning purpose. The authors of the book has/have taken all reasonable care to ensure that the contents of the book do not violate any existing copyright or other intellectual property rights of any person in any manner whatsoever. In the even the Authors has/ have been unable to track any source and if any copyright has been inadvertently infringed, please notify the publisher in writing for corrective action.

পর্যায়ভিত্তিক আলোচনা

পর্যায় –ক

একক ১ - রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্প

একক ২ – গল্পগুচ্ছঃ-নির্বাচিত গল্প – দেনাপাওনা, শাস্তি, কঙ্কাল।

একক ৩ - গল্পগুচ্ছঃ-নির্বাচিত গল্প – খোকাবাবুর প্রত্যাবর্তন, একরাত্রি, নষ্টনীড় ।

একক ৪ – গল্পগুচ্ছঃ-নির্বাচিত গল্প – হালদার গোষ্ঠী , স্ত্রীর পত্র।

একক ৫ - প্রেমেন্দ্র মিত্রের বাংলা ছোটগল্প

একক ৬ – প্রেমেন্দ্র মিত্রের বাংলা ছোটগল্প ও অন্যান্য গল্পের সংক্ষিপ্ত আলোচনা ।

একক ৭ - প্রেমেন্দ্র মিত্রের নিম্নবিত্ত জীবনের ভিন্নধর্মী বয়ান ।

পর্যায় –খ

একক ৮ - মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখক সত্তা ও সমকাল।

একক ৯ – মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের গল্পকেন্দ্রিক আলোচনা।

একক ১০ - মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্বাচিত গল্পের আলোচনা।

একক ১১ – সতীনাথ ভাদুড়ী - গল্পসাহিত্যের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি ও লেখক সত্তা।

একক ১২ - সতীনাথ ভাদুড়ীর গল্পের সংক্ষিপ্ত পরিচয় – চকাচকি, চরণদাস এম এল এ।

একক ১৩ –সতীনাথ ভাদুড়ীর নির্বাচিত গল্পের সংক্ষিপ্ত পরিচয় - ডাকাতের মা।

একক ১৪ - সতীনাথ ভাদুড়ীর নির্বাচিত গল্পের সংক্ষিপ্ত পরিচয় - পত্রলেখায় বাবা, বৈয়াকরণ ।

কোর পত্র – ৩০৩ (আবশ্যিক) বাংলা ছোটগল্প

পর্যায় –খ

একক ৮ - মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখক সত্তা ও সমকাল - মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখক সত্তা ও সমকাল, বিজ্ঞান ও মার্কসীয় চেতনা , মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছোটগল্প রচনার প্রেক্ষাপট ও প্রাথমিক সাহিত্য পরিচিতি।

একক ৯ - মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের গল্পকেন্দ্রিক আলোচনা - হারাণের নাতজামাই, দুঃশাসনীয়, প্রাগৈতিহাসিক, ছোট বকুলপুরের যাত্রী ।

একক ১০ - মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্বাচিত গল্পের আলোচনা - সরীসৃপ গল্পের আলোচনা , আত্মহত্যার অধিকার গল্পের কথা , কে বাঁচায় কে বাঁচে গল্পের চিত্রণ , যাকে ঘুষ দিতে হয় গল্পের আলোচনা , শিল্পী গল্পের ভিতরকার কথা।

একক ১১ - সতীনাথ ভাদুড়ী - গল্প সাহিত্যের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি ও লেখক সত্তা - ভূমিকায় সতীনাথ ভাদুড়ী , জন্ম-শিক্ষা, রাজনৈতিক জীবন, গল্পসাহিত্যের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি ও লেখক সত্তা।

একক ১২ - সতীনাথ ভাদুড়ীর গল্পের সংক্ষিপ্ত পরিচয় – চকাচকি, চরণদাস এম এল এ - চকাচকি গল্পের আলোচনা, চরণদাস এম এল এ গল্পের আলোচনা।

একক ১৩ - সতীনাথ ভাদুড়ীর নির্বাচিত গল্পের সংক্ষিপ্ত পরিচয় - ডাকাতের মা - ডাকাতের মা গল্প - গল্পের নিরিখে সতীনাথ ভাদুড়ীর গল্পকার প্রতিভার বৈচিত্র্য।

একক ১৪ - সতীনাথ ভাদুড়ীর নির্বাচিত গল্পের সংক্ষিপ্ত পরিচয় - পত্রলেখায় বাবা, বৈয়াকরণ - পত্রলেখায় বাবা, বৈয়াকরণ।

এককঃ-৮ মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখক সত্তা ও সমকাল

বিন্যাসক্রম

৮.১ মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখক সত্তা ও সমকাল

৮.২ বিজ্ঞান ও মার্কসীয় চেতনা

৮.৩ মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছোটগল্প রচনার প্রেক্ষাপট ও প্রাথমিক সাহিত্য পরিচিতি

৮.৪ অনুশীলনী

৮.৫ গ্রন্থপঞ্জি

৮.১ মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখক সত্তা ও সমকাল

“লেখক নিছক কলম পেশা মজুর”(লেখকের কথা)। সামাজিক দায় পালনের এপ্রথম আত্মসচেতনতায় অভিনব সিদ্ধান্তের প্রবক্তা মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রকৃত নাম প্রবোধকুমার। ‘জন্ম পত্রিকায় নাম ছিল অধরচন্দ্র, কিন্তু তাঁর জ্যৈষ্ঠ ভ্রাতৃজায়া অমিয়া বন্দ্যোপাধ্যায়ের সূত্রে জানতে পারা যায় গায়ের উজ্জ্বল কালো রঙ ও সুন্দর মুখশ্রী দেখে আঁতুড়ে তাঁর নামকরণ হয়েছিল কালো মানিক। এবং সেই সূত্রে তাঁর ডাক নাম হয় মানিক। বন্ধুদের সঙ্গে বাজি রেখে ‘বিচিত্রা’য় প্রথম গল্প পাঠানোর সময় লেখক হিসেবে নিজের ডাকনাম ব্যবহার করেছিলেন তিনি’।

১৯০৮ খ্রীঃ ১৯ মে সাঁওতাল পরগণার দুমকা শহরে মানিকের জন্ম হয়। তিনি ১৪টি ভাই বোনের মধ্যে সম্ভবত অষ্টম সন্তান। পিতা হরিহর বন্দ্যোপাধ্যায় সাবডেপুটি রেজিস্টার মা নিরদা সুন্দরী দেবী। মানিক ষোলো বছর বয়সেই মাতৃহীনা। যৌথ পরিবারের জীবন যাপন হেতু ছোটবেলা থেকেই স্নেহহীন উদাসীনতার শিকার। জ্যৈষ্ট

ভ্রাতা সুধাংশু কুমার ভারতবিখ্যাত মেট্রোলজিস্ট এবং উচ্চপদস্থ চাকুরে হওয়া সত্ত্বেও পরিবারের প্রতি নির্মমভাবের বিমুখ ছিলেন। তাই ব্যথিত, বিক্ষুব্ধ বিত্তহীন মানিক পিতার ভরণ পোষণের দায়িত্ব নিয়ে তাঁর দায়িত্বহীনতায় হয়েছেন সোচ্চার। ছোটবেলা থেকে বেপ্রোয়া ছন্নছাড়া স্বভাবের বশে জেলে- মালা ইত্যাদি শ্রমজীবী মানুষের মধ্যে ঘোরাফেরা, কুস্তি লড়া, ইস্কুলকে না গিয়ে কখনো শালবনের জঙ্গলে, কখনো এবা মহিষাদলে টাঙ্গাইলে বা ব্রাম্ভণবেরিয়া অঞ্চলে ঘুরে বেরানো, গায়ের আগুন নেভানোর কাজে এগিয়ে যাওয়া, গুন্ডা শায়েস্তা করা, শরীর থেকে কাঁচের টুকরো বের করার সময় শৈশবেই অসম্ভব সহ্য শক্তির পরিচয় দেওয়া ইত্যাদি বিচিত্র স্বভাব বিশিষ্টতায় তাঁর জীবন চিহ্নিত। মানিকের শিক্ষা আরম্ভ, প্রথমে মিত্র ইন্সিটিউশনে- পরে টাঙ্গাইলে এবং মেদিনীপুর জেলা স্কুলে। ১৯২৬ খ্রীঃ আবশ্যিক ও ঐচ্ছিক বিষয় গণিতে লেটার নিয়ে প্রথম বিভাগে ম্যাট্রিক পাশ করেন। ১৯২৮ খ্রী বাঁকুড়া ওয়েসলিয়ান মিশন কলেজ থেকে প্রথম আই এস সি পাশ করেন। তারপরে অঙ্কে অনার্স নিয়ে প্রেসিডেন্সিতে ভর্তি হন। বি এস সি কোর্স সম্পূর্ণ করার পূর্বে সাহিত্যিক হওয়ার তাড়নায় প্রীক্ষা পাশের কাজে গাফিলতি ঘটে। আর এখানেই একাডেমিক পড়াশোনায় ইতি হয়।

৮.২ বিজ্ঞান ও মার্কসীয় চেতনা

ছাত্রজীবন থেকেই তার বিজ্ঞানের প্রতি ছিল অপরিসীম অনুরাগ। এই অনুরাগের বশে বিজ্ঞানের বিভিন্ন গ্রন্থ পরে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি অর্জনের শিক্ষা লাভ করেন। জাত বৈজ্ঞানিক কেন ধর্মী জীবনজিজ্ঞাসার জাগরণ হয়, উপন্যাসে সমাজ বাস্তবতার অনুসন্ধানে তার প্রয়োগ-রূপায়ণ ঘটে। বিজ্ঞান পড়ার প্রয়োজন তার মতে, "সরাসরি বিজ্ঞানের কিছু শিক্ষা পাওয়া নয়, উপন্যাস লেখার জন্য দরকার খানিকটা বৈজ্ঞানিক বিচার বোধ। প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভাবে বিজ্ঞান প্রভাবিত মন উপন্যাস লেখার জন্য অপরিহার্য রূপে প্রয়োজন।"(উপন্যাসের ধারা) অভিজ্ঞতালব্ধ ঘটনার চুলচেরা বিশ্লেষণে বা কার্যকারণ আবিষ্কারে যুক্তিনির্ভর মানসিকতার মধ্যে প্রতিফলিত হয় এই বিজ্ঞানচেতনা। অন্যদিকে এই বিজ্ঞানচেতনার প্রতিফলনেই আসে অন্তর্মনের জটিলতা অনুসন্ধান। সিকমুন্ড ফ্রয়েডের গ্রন্থসমূহের নিষ্ঠাশীল পাঠকরূপে নরনারীর সম্বন্ধ নির্ণয়ে

লক্ষ্য করেন চেতন-অবচেতনের প্রভাব। প্রথম পর্যায়ের গল্প উপন্যাসে দেখা যায় তার প্রকাশ। শোনা যায় ফ্রয়েড জীবনের শেষ পর্যায়ে নাকি অবৈজ্ঞানিক অলৌকিকতায় আচ্ছন্ন হয়ে পড়ায় ইয়ুং প্রমুখ তার অনুগামীরা ভিন্নতর ভাবনার সন্ধান করেন। খুব সম্ভবত মানিকও পরবর্তীকালে এই কারণে ফ্রয়েডে শেষ আস্থা খুজে না পেয়ে মাকর্সীয় ভাবনার সন্ধান করেন। মাকর্স – এঙ্গেলস – লেলিন – কডওয়েল – সিডনি – ফিনকাইস্টাইন প্রমুখ লেখকদের লেখা সযত্নে পড়েন। লেলিনের উক্তি ডাইরির পাতায় নোট করেন। "Learn from the masses, try to comprehend their action; carefully study the practical experience of the struggle of the masses." আবার পার্টির নিষ্ঠাবান কর্মী হয়ে মহম্মদ আলী পার্কের মিছিলের অভিজ্ঞতা থেকে লেখেন 'চিহ্ন' ইত্যাদি উপন্যাস বা তেভাগা আন্দোলনের পটভূমিতে একাধিক গল্প। বস্তুত, মাকর্সবাদের পরিচয়ের পর বিজ্ঞান স্নগক্রান্ত গ্রন্থপাঠ, প্রগতিসংঘের সাপ্তাহিক বৈঠকে নিয়মিত উপস্থিতি, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা এবং হিন্দু বা মুসলমানের মিলিত ঐক্যবদ্ধ তেভাগা সংগ্রাম, সাজানো রাজনীতির নোংরা চক্রান্ত, শোষক – জোতদারের বিরুদ্ধে সংগ্রামী কৃষকশ্রেণির প্রতিবাদ প্রবণ মনোভাব ইত্যাদি ঘটনাসমূহ মানিকের মনোজগতে ছায়া ফেলে। তাই পরে নিজে অকপটে স্বীকার করেন, "লিখতে আরম্ভ করার পর জীবন ও সাহিত্য সম্পর্কে আমার দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন আগেও ঘটেছে। মাকর্সবাদের সঙ্গে পরিচয় হবার পরারো ব্যপক ও গভীর ভাবে সে পরিবর্তন ঘটাবার প্রয়োজন উপলব্ধি করি। মাকর্সবাদ যেটুকু বুঝেছি, তাতেই আমার কাছে ধরা পড়ে গিয়েছে, আমার সৃষ্টিতে কত মিথ্যা, বিভ্রান্তি আর আবর্জনা আমি আমদানি জীবন ও সাহিত্যকে একান্ত নিষথার সঙ্গে ভালোবেসেও, জীবন ও সাহিত্যকে এগিয়ে নেবার উদ্দেশ্য থাকা সত্ত্বেও। মাকর্সবাদই আমাকে এটাও শিখিয়ে যে, এ জন্য আফসোস করলেও নিজেকে ধিক্কার দেবার প্রয়োজন নেই।" (সাহিত্য করার আগে, লেখকের কথা।) ১৯৪৪ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারি চিন্মোহন সেহানবিশের মতে, ১৯৪৩ খ্রীঃ প্রথম দিকে ফ্যাসিস্ট বিরোধী লেখক ও শিল্পী সংঘে যোগদান এবং কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য পদ লাভ করেন। এরপরে ১৯৪৯ খ্রীঃ এপ্রিল মাসে সংঘের চতুর্থ সম্মেলনে এবং ১৯৫৩

খ্রীঃ এপ্রিলের দ্বিতীয় সপ্তাহে মানিকের সভাপতিত্বে পঞ্চম এবং শেষ বার্ষিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়।

৮.৩ মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছোটগল্প রচনার প্রেক্ষাপট ও প্রাথমিক সাহিত্য পরিচিতি

"মানিকই একমাত্র আধুনিক লেখক যে 'কল্লোল' ডিঙ্গিয়ে বিচিত্রায় চলে এসেছে – পটুয়াটোলা ডিঙ্গিয়ে পটলডাঙ্গায়। আসলে সে 'কল্লোলের'ই কুলবর্ধন।"

-কল্লোলযুগ(অচিন্ত্য কুমার সেনগুপ্ত)

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম স্মরণ হতেই আমাদের চোখের সামনে প্রথমেই ভেসে ওঠে "পদ্মানদীর মাঝি" কিংবা "পুতুলনাচের ইতিকথা"র কথা। তবে তিনি শুধুমাত্র উপন্যাসই রচনা করেননি, উপুন্যাসের পাশাপাশি সাহিত্যের অন্যতম উত্তসূরি ছোটগল্পের জগতেও তিনি অবাধভাবে বিচরণ করেছেন। ছোটগল্প রচনার ক্ষেত্রে তিনি অর্থাৎ প্রবোধকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় (প্রকৃত নাম) একজন বাস্তববাদী সাহিত্যিক। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পর্কে ভূদেব চৌধুরী "বাংলা সাহিত্যের ছোটগল্প ও গল্পকার" গ্রন্থে জানিয়েছেন।

"আমাদের কথা সাহিত্যে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় নতুন আগুনের এক মস্ত মশাল; বুঝি দেশকালের প্রতিকূলতার ফলেই সে মশাল আকাশে উর্দ্ধশিখা মেলে জ্বলবার সাধনায় অনেকখানি ধোঁয়া আর ছাই হয়ে নিঃশেষিত হয়ে গেল। এই মহৎ বিনষ্টি ইতিহাসের পরম জিজ্ঞাসার উপকরণ, একদিন তার উত্তর নিজের প্রয়োজনেই খুঁজে পেতে হবে দেশকে-দেশের সাহিত্যকে।"

সুন্দর সমাজ সচেতন জীবন ঘনিষ্ঠ সাহিত্যকর্মে নিবেদিত প্রাণ লেখক মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় (১৯০৮-১৯৬৫)-এর জন্ম হয়। আসল নাম সুবোধকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়। তবে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় হিসাবেই তিনি সর্বাধিক পরিচিত। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের পিতার নাম হরিহর বন্দ্যোপাধ্যায়। পিতার চাকরি সূত্রে সাঁওতাল পরগনার দুমকায় তাঁর পরিবার চলে আসেন। এইখানেই মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের জন্ম হয়। কিন্তু পূর্ববঙ্গের নদীনালা, খালবিল, তেলে-জলেই

তিনি বড় হয়ে ওঠেন। তাই সেই অঞ্চলের সাধারণ মানুষের কথা, জীবন, পারিপার্শ্বিক চিত্রগুলো নিপুণ দক্ষতার সাথে ফুটিয়ে তুলতে সক্ষম হন। অসংখ্য অভিজ্ঞতার ভারে নুইয়ে পড়া মানিক পাঠককে তার অভিজ্ঞতার পাশে আবদ্ধ রাখতেই লেখা শুরু করেন। সামাজিক শ্রেণি বৈষম্য, শোষণ, নিপীড়ন, অসঙ্গতির বিরুদ্ধে সোচ্চার তার লেখনি মার্কসবাদে দীক্ষা নেয়। জীবনের একটা পাঠান্তর হিসেবে ধরে নেয়া যায়। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় ১৯৩৫ সাল থেকেই লেখালেখি শুরু করেন। তিনি যখন সাহিত্য জগতে প্রবেশ করেন, তখন ফ্রয়েডীয় মনোবিকারতত্ত্ব সাহিত্যিক মহলে খুব জনপ্রিয়তা পান এবং এবং পাঠকপ্রিয় হয়ে ওঠেন।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় কবিতা লিখেছেন, নাটক লিখেছেন, প্রবন্ধ লিখেছেন; কিন্তু আসলে তিনি কথাশিল্পী, ঔপন্যাসিক ও ছোট গল্পকার। যা তাঁর প্রতিভার বিচ্ছুরণ ঘটিয়েছে। যতটুকু জানা যায়, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখা ছাপার অক্ষরে প্রকাশ পেতে থাকে তাঁর ২০/২১ বছর বয়সে। ১৯২৮ সালে প্রথম লিখতে শুরু করেন গল্প আর প্রথম মুদ্রিত গল্প 'অতসী মামী'। আর প্রথম উপন্যাস 'দিবারাত্রির কাব্য' ১৯২৯ সালে প্রথম প্রকাশিত হয়। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁকে ঔপন্যাসিক হিসাবেই চিহ্নিত করতে চেয়েছেন-অন্য কিছু নন তিনি, তিনি ঔপন্যাসিক। কিন্তু আমরা মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়কে চিহ্নিত করবো একই সঙ্গে গল্পকার ও ঔপন্যাসিক হিসাবে। কারণ তিনি কেবল ঔপন্যাসিক হিসাবে সফল নন, বরঞ্চ গল্পকার হিসাবে সফলতা অর্জন করেছেন। এ প্রসঙ্গে সুকুমার সেন মনে করেন, 'ছোটগল্পগুলিতেই শিল্পী মানিকবাবুর শ্রেষ্ঠ পরিচয় নিহিত।' মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় প্রায় তিন দশক ধরে লিখেছিলেন প্রায় ৪০টির মতো উপন্যাস এবং তিনশতর মতো গল্প। তিনি তাঁর সংক্ষিপ্ত ৪৮ বছরের জীবনকে সম্পূর্ণ উৎসর্গ করেছিলেন সাহিত্যে।

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত মানিককে বলেছেন, 'কল্লোলের কুলবধন।' বুদ্ধদেব বসু বলেছেন, 'ইবষধঃবফ কধষষড়ষবধহ' কল্লোলের সর্বজ্যেষ্ঠ লেখক নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত (১৮৮২-১৯৬৪) আর আনুজ বিষ্ণু দে (১৯০৯-'৮২))। দিনেশরঞ্জন দাশ সম্পাদিত কল্লোল পত্রিকা চলছিল বছর সাতেক। রবীন্দ্রোত্তর তরুণ লেখকদের মুখ্যতম মাধ্যম ছিল এই পত্রিকা। 'কালিকলম', 'প্রগতি' ইত্যাদি আরো অনেক পত্রিকা ছিল তরুণ

সাহিত্যের বাহন। কিন্তু 'কল্লোল' এর নামেই আধুনিক উত্তর জৈবিক আধুনিক সাহিত্য প্রতিষ্ঠিত হয়। 'কল্লোল' সম্পর্কে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় ছিলেন শ্রদ্ধাশীল।

বুদ্ধদেব বসু ও অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের ভাষ্য অনুসারে আমরা মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়কে বিলম্বিত কল্লোলীয় বলেই মনে করি।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের জীবদ্দশায় তার ১৬টি গল্পগ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছিল। গল্পগুলোর নাম নিম্নে উল্লেখ করা হলো।

১. অতসী মামী (১৯৩৫), ২. প্রাগৈতিহাসিক (১৯৩৭), ৩. মিহি ও মোটা কাহিনী (১৯৩৮), ৪. সরীসৃপ (১৯৩৯), ৫. বৌ (১৯৪০/দ্বিতীয় সং ১৯৪৬), ৬. সমুদ্রের স্বাদ (১৯৪৩), ৭. ভেজাল (১৯৪৪), ৮. হলুদপোড়া (১৯৪৫), ৯. আজ কাল পরশুর গল্প (১৯৪৬/দ্বিতীয় সং ১৯৫০), ১০. পরিস্থিতি (১৯৪৬), ১১. খতিয়ান (১৯৪৭), ১২. মাটির মাশুল (১৯৪৮), ১৩. ছোট বড় (১৯৪৮), ১৪. ছোট বকুলপুরের যাত্রী (১৯৪৯), ১৫. ফেরিওলা (১৯৫৩/দ্বি-সং ১৯৫৫), ১৬. লাজুকতা (১৯৫৪)।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের জন্মের শতবর্ষ পূর্ণ হয়ে গেল, মৃত্যুর পরেও কেটে গেল বাহান্ন বছর। মাত্র ৪৮ বছরের জীবনকালে ২৭ বছরের লেখক জীবনে তাঁর রচনার পরিমাণ বিপুলই বলতে হবে।সেদিক থেকে তার অকালমৃত্যু হয়েছে, একথা বলার উপায় নেই, বরং লেখক হিসাবে তাঁর সারা জীবনের সৃষ্টি সামনে রাখলে বুঝতে বাকি থাকে না, তাঁর রচনা পূর্ণ পরিণতিতেই পৌঁছেছিলো; দীর্ঘতর জীবন লাভ করলে তাঁর লেখক জীবনও যে দীর্ঘতর ও পূর্ণতর হতো এমন মনে হয় না। বিশ বছর বয়স থেকে আটচল্লিশ বছর বয়স পর্যন্ত তাঁর লেখা সকাল-মধ্যাহ্ন-অপরাহ্নের পূর্ণ বৃত্তই ঘুরে এসেছিলো।

লিখতে শুরু করার পর থেকেই তিনি সাহিত্যপাঠকের মনোযোগ পেয়েছিলেন। সাধারণ পাঠকের কথা বলছি না, জনপ্রিয়তার কথাও নয়। আদপে সাধারণ পাঠকের সংখ্যার হ্রাস-বৃদ্ধি আর কবে বোঝা যায়? জনপ্রিয়তাই বা ঠিক ঠিক কী করে মাপা যায়? বই বিক্রির সংখ্যা জানতে চেয়ে বা কেমন ধরনের কত পাঠক কিনে বই পড়লেন এই সব খবর নিয়ে কি খুব লাভ হয়? মানিকের বেলায় সাধারণভাবে পাঠকপ্রিয়তার কথা বলা যায় না। কিন্তু বলা চলে সাহিত্যপাঠক বা সমঝদার পাঠকদের মনোযোগ তিনি শুরু

থেকেই পাচ্ছিলেন। এঁদের মধ্যে পত্রিকার ঝানু-সম্পাদক আছেন, সাহিত্যের সমালোচক আছেন, আর অবশ্যই অনুরাগী প্রাগ্রসর অভিজ্ঞ পাঠকও আছেন।

প্রথম গল্প'অতসী মামী' ছাপা হবার ব্যাপারে তাঁর আত্মবিশ্বাস মনে রাখার মতো। এই গল্প লেখার আগে হাত মকশোর আরো লেখা কিছু আছে কিনা জানি না, তবে তাঁর আত্মবিশ্বাস থেকে মনে হয় 'অতসী মামী' গল্পটিকেও তিনি নেহাত কাঁচা লেখা বলে মনে করেননি। গল্পটি ছাপার পরে 'বিচিত্রা'র সম্পাদক নিজে এসে দশ টাকা সম্মানী দিয়েছিলেন এবং আরো গল্প

চেয়েছিলেন, ছেপেছিলেন আরো দুটি গল্প। বার কতক 'মানিকলাল, মানিকলাল' বলে উল্লেখ করলেও সে-সময়ের মহাবিদ্বান জাঁদরেল সমালোচক ধূর্জটীপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় তাঁর প্রথম পর্বের উপন্যাস নিয়ে সপ্রশংস মন্তব্য করেছিলেন। একটা বিশেষ অবস্থান থেকে গোপাল হালদার, সরোজ দত্তর মতো সমঝদার সাহিত্যিকরাও গভীর আগ্রহের সঙ্গে তাঁর প্রতিটি লেখাই পড়েছিলেন, আলোচনা করেছিলেন। তবু চলতি কথায় যাকে জনপ্রিয় লেখক বলা হয়, তেমন জনপ্রিয় লেখক মানিক বন্দোপাধ্যায় তখনো ছিলেন না, আজও নন।

তুলনায় তাঁর একেবারে সমসাময়িক দুজন লেখক বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের পাঠকপ্রিয়তা বেশি ছিল বলেই মনে হয়। অবশ্য মুগ্ধপাঠক, বশীভূত পাঠক, প্রায় আত্মবিস্মৃত পাঠক শরৎচন্দ্রের চেয়ে বেশি আর কারো ছিলো না। নিজের কথা মনে করেই বলতে পারি — তবে তারপরে বিভূতিভূষণ এবং তারাশঙ্করের কথাই বলতে হয়। বিভূতিভূষণ বরাবরই পাঠকপ্রিয়, সত্যজিৎ ছাড়াও, আজও তাই। 'পথের পাঁচালী', 'আরণ্যক','অপরাজিত' পড়েছেন এমন অনেক অপ্রত্যাশিত অসম্ভব পাঠকের সন্ধান পেয়ে আমি বরাবর আশ্চর্য হয়েছি। বিভূতিভূষণের পরেই কিন্তু জায়গাটা তারাশঙ্করের, মানিকের নয়।

তাঁর মৃত্যুর পরেও তাঁকে নিয়ে লেখালিখি, বিতর্ক কখনোই একেবারে থেমে যায়নি। বরং তৈরিই হয়ে গেছে সমালোচনা-সাহিত্যের একটি বড় ধারা। এইসব থেকেই তাঁর বিস্ময়কর প্রভাবটা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। বাংলাদেশেও স্বাভাবিক নিয়মে, ভালো-মন্দ যা-ই হোক, সবকিছু ভিন্নপথ ধরলেও মানিকের প্রতি আগ্রহ কিন্তু অনেক চড়াই-উৎড়াই

পেরিয়ে এই বর্তমানে যেন প্রবলই হয়ে উঠেছে। জনপ্রিয়তা নয়, তাহলে এ কি মানিক-সাহিত্যের উৎকট স্বাতন্ত্র্য? হতে পারে অস্বস্তিকর কিন্তু অনস্বীকার্য মানিকের সাহিত্যশাসনের প্রবলতা।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিপুল সৃষ্টি নিয়ে বিশেষভাবে বা সাধারণভাবে আমি কোনো আলোচনায় ঢুকতে চাই না। গত পঞ্চাশ বছর ধরে এ-রকম বিশ্লেষণের, মূল্যায়নের চেষ্টা মোটামুটি নিরবিচ্ছিন্নভাবেই চলছে, তাতে আজও ভাটা পড়েছে এমন নয়। গজ-ফিতে-লগি-বৈঠা ইত্যাদি ব্যবহার করে তাঁর সাহিত্যের মৌলিকতা, গভীরতা, প্রকৃতি ও পরিসীমার আন্দাজ নেবার চেষ্টাও চলছে। আমি নিজেও কখনো-কখনো আমার সাধ্যমতো তেমন আলোচনায় মন দিয়েছি; কিন্তু এখানে আমি মূল্যায়ন বা বিচারের প্রসঙ্গটি পাড়তেই চাই না।

বাংলা সাহিত্যে বা একালের বিশ্ব-কথাসাহিত্যে তাঁর স্থানটি ঠিক কোথায় সে নিয়ে হাজাররকম কথা হবে, তা আমরা জানি, তারপরেও গণিতের নিয়মে চূড়ান্ত কোনো সিদ্ধান্ত হতে পারবে না, তা-ও আমাদের জানা। তাই বলে কি এটাও আমাদের জানা নয় বা স্থির নয় যে, সব বিতর্কের উপরে বাংলা সাহিত্যে বা আমাদের চোখে একালের বিশ্বসাহিত্যে তাঁর একটা জায়গা আপেক্ষিক হলেও স্থায়ী হবেই? এটা শিরোধার্য করেই এখন তবে অন্য কিছু কথা।

সাহিত্যের একটা ঐতিহ্য তৈরি হতে কত দিন লাগে কেউ নিশ্চিত করে বলতে পারে না। এমন একটা ধারাই বা কতদিনে সৃষ্টি হতে পারে যাকে বলা যাবে মূলধারা? বঙ্কিমচন্দ্র থেকে রবীন্দ্রনাথ-শরৎচন্দ্রের অন্তিমপর্ব পর্যন্ত বাংলা কথাসাহিত্যের চিনতে পারার মতো একটা ধারা তৈরি হয়েছে বলে যদি মেনে নিই, তাহলে কি বলতে পারি মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের রচনা তা থেকে একেবারে ভিন্ন পথে মোড় নিয়েছে? যদি পারি তাহলে একথাটা বলার পরেও আমি নতুন, মৌলিক, অভিনব ইত্যাদি শব্দ ব্যবহার করতে চাই না। প্রায় ধাঁধাঁর মতো, এসব শব্দে সকলের স্বীকার্য সুরাহা হবার সম্ভাবনা প্রায় নেই।

আমাদের মনে পড়বে নতুন-পুরনোর তর্ক গত শতকের বিশের দশকেই উঠে পড়েছে, ঘোষণা দিয়ে বা না-দিয়ে। ‘কল্লোল’, ‘কালি-কলম’ ইত্যাদি সাহিত্য পত্রিকা নতুন

সাহিত্যের পতাকা উড়িয়ে দিয়েই কাজে নেমেছে। নতুন, বিদ্রোহী, দুঃসাহসী, আন্তর্জাতিক, আধুনিক, অলজ্জ যৌনতাচেতন ইত্যাদি লবজ দিয়ে শ্রেণীকরণ, বর্গীকরণ তখনই বেশ শুরু হয়ে গিয়েছিল।

মানিক একটুখানি দেরিতে এলেন, কিন্তু এ-সবের কোনোকিছুতেই গেলেন না। তাঁর লেখা শুরু হলো তাঁর নিজের লেখক-স্বভাবে। তাই মৌলিক, নতুন এসব না বলে বরং বলা যাক তিনি ঐ-রকম। আলাদা দেখছেন, আলাদা ভাবছেন। মানুষ, সমাজ, সময় যেভাবে দেখছেন, তা একেবারেই ভিন্ন, আর কারো সঙ্গে মিলছে না। বাংলা কথাসাহিত্যের সঙ্গে যোগসূত্র রাখার কোনো ভাবনাই তাঁর মাথায় নেই। তিনি শুরু করছেন সম্পূর্ণ নিজে নিজে। হাত মকশ করবার সময়ও যেন নেই, এক্ষুনি লিখে ফেলতে হবে যা লেখার।

সঙ্কল্প করছেন লেখক হবেন, আর কিছু নয়। তাঁর নিজের ভাষায় সাহিত্যের কোন্ শেষ থেকে তিনি শুরু করবেন তা নিয়েও তাঁর চিন্তা নেই। কাজেই প্রথম থেকেই তাঁর লেখা আলাদা আর নতুন। এইটুকুই। এখানে অন্ততপক্ষে মৌলিকত্ব, নতুনত্ব ইত্যাদি প্রসঙ্গ টেনে নিয়ে এসে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরাটত্ব বা মহত্ত্ব ঠাহর করবার দরকার নেই। তার চেয়ে তাঁর ভিন্নতা আর নতুনত্বের ধরনটা বোঝার চেষ্টা করাই বেশি কাজের হবে।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় মূলত তার লেখনীতে বিশাল বিস্তীর্ণ নদ-নদীর পটভূমিকায় সাধারণ মানুষের কথা যেমন বস্তুনিষ্ঠ জীবনচিত্র অঙ্কন করেছেন, তেমনি মানুষের কর্মে পিপাসায় জীবনচিত্র তুলে ধরতে গিয়ে আদিমতার অন্ধকারে ফিরে গেছেন বার বার। অদ্ভুত নিরাসক্তভাবে তিনি মানুষের জীবন ও সমস্যাকে দেখেছেন, সমাধানের চেষ্টাও করেছেন বুদ্ধি ও লেখনীতে। নর-নারীর জৈবসত্তা বিকাশের নানাদিক তাকে আকৃষ্ট করেছিল। তার লেখায় জৈবসত্তা ও দৈহিক বর্ণনায় ছিলেন কিছুটা বেপরোয়া প্রকৃতির। দৈহিকভাবে অসুস্থ হলেও মানসিকভাবে যথেষ্ট বলিষ্ঠ ছিলেন মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়। সেই বলিষ্ঠতা রক্তের উষ্ণ-স্রোত উত্তাপ টের পাওয়া যায় তার গল্প-উপন্যাসের চরিত্রের বর্ণনায়, পেশায়, কাজে-কর্মে। মানিকের সাহিত্যাঙ্গনে প্রবেশটা একটা চমক এবং চমক ‘অতসী মামী’ রচনার ইতিহাস, চমক ‘দিবারাত্রির কাব্য (১৯৩৫), ‘জননী’ (১৯৩৫),

'পদ্মানদীর মাঝি' (১৯৩৬), 'পুতুলনাচের ইতিকথা' (১৯৩৬), 'অহিংসা' (১৯৪৮) ও চতুষ্কোণ (১৯৪৩) প্রভৃতি। পাঠকের চেতনাকে নাড়া দিতে পেরেছেন বলেই এগুলো পাঠকের কাছে আদরণীয়।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের জীবন অভিজ্ঞতা ছিল ব্যাপক ও গভীর। ফলে তিনি জীবনের দিকটি দেখতেন তার সমগ্রতায়, খণ্ড খণ্ড করে নয়, অখণ্ডতায়। এটি তাঁর প্রধান গুণ এবং লেখক মাত্রেরই শ্রেষ্ঠ গুণ। তিনি যেমন ফ্রয়েডীয় মতবাদে প্রভাবিত হয়েছিলেন, ঠিক তেমনি জীবনের, মনুষ্য জীবনের মুক্তি দেখেছিলেন মার্কসবাদে। মার্কসবাদই তাঁকে দীক্ষা দেয়। এই মতবাদেই তিনি জীবন ও জগৎ সম্পর্কে যে বিশ্বাস পোষণ করেন, তাই তাঁর সাহিত্য জীবনের পাথেয়। মনে রাখতে হয়, ব্যক্তিগতভাবে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় ছিলেন মধ্যবিত্ত মানসিকতারই উত্তরাধিকারী। তাঁর প্রথম গল্পগুচ্ছ 'অতসী মামী ও অন্যান্য' সংকলনে সব কয়টি গল্প এবং প্রথম উপন্যাস 'দিবারাত্রির কাব্য' মধ্যবিত্ত জীবনভিত্তিক কাহিনী নিয়ে গড়া। মানিক বন্দোপাধ্যায় যখন কৈশোর পেরিয়ে যৌবনের মুখে এসেছিলেন, তখন থেকেই বাঙালির মধ্যবিত্ত জীবনে সার্বিক অবক্ষয়ের চেতনা চারপাশ হতে ঘিরে চেপে বসতে চাইছিল। বিশ্বজোড়া মধ্যবিত্ত বৈমানসিকতা বোধের তাড়নায় বাংলা সাহিত্য তখন পীড়িত। পাঠকের অভিজ্ঞতাতেও এ নিয়ে তারতম্য ছিল না। তবু তাঁর অন্তরের আকাঙ্ক্ষা ছিল অন্ধকারের নিরবচ্ছিন্নতাকে উতরিয়ে উত্তরণের পথ খোঁজার। সে জন্যই তিনি চিরস্মরণীয় ও বরণীয়।

৮.৪ অনুশীলনী

১) ছোটগল্পের ইতিহাসে মানিকের অবদান সংক্ষেপে বর্ণনা কর।

২) কল্লোলের শেষ পর্যায়ে, সময়কালের নিরিখে মানিকের গল্পে বৈচিত্র্য কতপ্রকার এসেছে সংক্ষিপ্ত পরিচয় দাও।

৩) মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের গল্পে মাকর্সীয় চেতনা ও মনস্তাত্ত্বিক জটিলতা কেমন ভাবে এসেছে? আলোচনা কর।

৮.৫ গ্রন্থপঞ্জি

১) চক্রবর্তী, যুগান্তর – মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের শ্রেষ্ঠ গল্প, বেঙ্গল পাবলিকেশন প্রাঃ লিঃ।

২) চৌধুরী, শ্রীভূদেব, - বাংলা সাহিত্যের ছোটগল্প ও গল্পকার, মর্ডাণ বুক এজেন্সি প্রাঃ লিঃ।

৩) দত্ত, বীরেন্দ্র – বাংলা ছোটগল্প প্রসঙ্গ ও প্রকরণ(প্রথম খন্ড), পুস্তক বিপণি।

৪) বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রী শ্রীকুমার – বঙ্গ সাহিত্যে উপন্যাসের ধারা, মর্ডাণ বুক এজেন্সি প্রাঃ লিঃ।

৫) চট্টোপাধ্যায়, তপনকুমার – আধুনিক বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস, প্রজ্ঞা বিকাশ।

এককঃ–৯ মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের গল্পকেন্দ্রিক আলোচনা

বিন্যাসক্রম

৯.১ মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের গল্পকেন্দ্রিক আলোচনা

৯.২ হারাণের নাতজামাই

৯.৩ দুঃশাসনীয়

৯.৪ প্রাগৈতিহাসিক

৯.৫ ছোটবকুলপুরের যাত্রী

৯.৬ অনুশীলনী

৯.৭ গ্রন্থপঞ্জি

৯.১ মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের গল্পকেন্দ্রিক আলোচনা

ছোটগল্প রচনায় রোমাঞ্চ আছে। এতে গভীর মনোসংযোগ করতে হয়। এত দ্রুত তালের সঙ্গে সঙ্গতি রক্ষা করে চলতে হয় বলেই মন কখনো বিশ্রাম পায় না। ছোটগল্প লেখার সময়ে প্রতি মুহূর্তে রোমাঞ্চ বোধ করি।

১৯৫৪ সালে ‘কেন লিখি’ নামে একটি সংকলন বেরিয়েছিল ফ্যাসিস্টবিরোধী লেখক ও শিল্পী সংঘের পক্ষে। সংকলনটির সম্পাদক ছিলেন হিরণকুমার সান্যাল ও সুভাষ মুখোপাধ্যায়। ‘বাংলাদেশের বিশিষ্ট কথাশিল্পীদের জবানবন্দি’- এই ঘোষণা থাকলেও সংকলনটিতে কথাশিল্পীদের সঙ্গে কবিরাও অংশগ্রহণ করেছিলেন। ওই সংকলনটিতে অন্যদের সঙ্গে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ও একটি লেখা লিখেছিলেন। নিতান্তই ফরমাশি রচনা। কিন্তু বাস্তবিকই সেটি ছিল তাঁর অসাধারণ রচনা। তার মধ্যে প্রতিভাসিত

হয়েছে শিল্পীমাত্রেই, কিন্তু বিশেষভাবে প্রতিবিম্বিত হয়েছেন মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় নিজে। ‘লেখা ছাড়া অন্য কোনো উপায়েই যে সব কথা জানানো যায় না সেই কথাগুলো জানাবার জন্যই আমি লিখি।’ -এই কথাটিই উক্ত রচনাটির প্রথম চরণ।

এই উক্তিটির মধ্যেই মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সমস্ত শিল্পকর্মের যে সচেতন বুদ্ধির প্রকাশ পায় তাই স্পষ্ট হয়ে ওঠে। ‘কেন লিখি’র তিন বছর পরে ১৯৪৭ সালে, শারদীয় ‘স্বাধীনতা’ পত্রিকায় মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় ‘প্রতিভা’ নামে আরেকটি প্রবন্ধ লিখেন। ওই প্রবন্ধে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় বুঝাতে চেয়েছেন প্রতিভা কোনো ‘ঈশ্বরপ্রদত্ত রহস্যময় জিনিস’ নয়। বুঝালেন, ‘প্রতিভা আসলে এক। বৈজ্ঞানিক আর কবির প্রতিভায় মৌলিক পার্থক্য কিছু নেই- পার্থক্য শুধু বিকাশ আর প্রকাশে।’ এখানে ‘কবি’ বলতে লেখক শিল্পী মাত্রকেই বুঝিয়েছেন মানিক। আর প্রতিভা জিনিসটা কী?- না, ‘দক্ষতা অর্জনের বিশেষ ক্ষমতা।’ এছাড়া আর কিছুই নয়।

৯.২ হারাণের নাতজামাই

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পূররববর্তী সময়ে রচিত গল্পগুলিতে মানিক মধ্যবিত্ত জীবনের অন্তঃসারশূণয়তা, নীচতা, পাশবতা ও হিংস্রতাকে রূপ দিয়েছেন। ভদ্র মধ্যবিত্ত জীবনের আপাপ্ত ভদ্রতার আড়ালে যে হিংস্রতার রূপ আছে তার উদ্‌ঘাটন করেছেন গল্পকার। আবার

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী কালে ভারতের রাজনৈতিক ও সামাজিক জীবনে অস্থিরতা ও পরিবর্তনের কাল। আকাল দাঙ্গা জর্জরিত, রেশন - কন্ট্রোল – লঙ্গরখানা – ব্ল্যাক মার্কেট প্রত্যক্ষ করেছিলেন, সেই অভিজ্ঞতাজাত ঘটনার রূপ পেয়েছে বেশ কয়েকটী গল্পে। ‘হারাণের নাতজামাই’ এই সময়ের গল্প। এই গল্পে আছে কঠিন বাস্তবের ছবি এবং রয়েছে সংগ্রামী গ্রামীণ কৃষক শ্রেণির সমবেত প্রতিরোধী শক্তির ভূমিকা। এই গল্পের পটভূমি রক্তক্ষয়ী তেভাগা আন্দোলনের পটভূমি। এই আন্দোলনের পটভূমিকায় শোষিত, সর্বহারা, মানুষের দুখের কাহিনি এই গল্পে লিপিবদ্ধ হয়েছে।

'হারাণের নাতজামাই' গল্পের শুরুতেই লেখক জোতদার চন্ডী ঘোষ ও তার সঙ্গী কানাই এবং শ্রীপতিদের জোর জবরদস্তিতে ধান মাঠ থেকে তুলে নেওয়ার বিরুদ্ধে খেটে খাওয়া চাষীদের দুখের দিনগুলির ছবি এঁকেছেন। শ্রমিক নেতা ভুবন মন্ডলেকে গ্রেপ্তারের জন্য গ্রাএ পুলিশ এলে কিভাবে ময়নার মা তার প্রত্যুৎপন্নমতিত্বের সাহায্যে তাকে পুলিশের হাত থেকে বাঁচাল তারই কাহিনি বর্ণিত হয়েছে। এই গল্পের ময়নার মা কোন ব্যক্তির মা হিসেবে নয়, সর্বজনের ত্রাণোকারী হিসেবে চিত্রিত হয়েছে। পুলিশ ইন্সপেক্টোর মন্মথর গুলি চালাবার হুকুম দেওয়ার আগের মুহূর্তে ময়নার মায়ের দুর্দান্ত অভিনয় অপরূপ শিল্পরূপ লাভ করেছে এভাবে – "ময়নার মার খ্যানখেনে তীক্ষ্ম গলা শীতার্ত থমথমে রাত্রিকে ছিঁড়ে কেটে বেজে উঠল, 'রত্ত দিকি তোমরা, হাঙ্গামা কইরো না। মোর ঘরে কোন আসামী নাই। বিকালে জামাই আইছে, শোয়াইছি মাইয়্যা জামাইরে। দারোগাবাবু তাল্লাস করতে চান, তাল্লাস করেন। ... দ্যাখেন, আইস্যা, তাল্লাস করেন। ভুবন মন্ডল কেডা? নাম তো শুনি নাই বাপের কালে।"

৯.৩ দুঃশাসনীয়

মানিকের 'দুঃশাসনীয়' গল্পে প্রাধান্য পেয়েছে কঠিন প্রতিবাদ ও তিক্ততা। এই গল্পের প্রেক্ষাপট দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়ের, যখন মন্বন্তরের ফলে সাধারণ মানুষের জীবন দুর্বিষোহ হয়ে উঠেছিল। তবে এই গল্পে শুধু মন্বন্তর ও অন্নাভাবের ছবি নেই, আছে মনুষ্যসৃষ্ট বস্ত্র সংকটের রূপ। তাই এই গল্প কঠিন সত্যের মুখোমুখি দাঁড়ানো প্রতিবাদের গল্প। এই প্রতিবাদ সমস্ত রকম্বৈম্যের বিরুদ্ধে। এই গল্পের প্রকরণে আছে নতুনত্ব। গল্পের প্রচলিত ছক ভেঙ্গে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় কাহিনি এবং মায়কও বর্জন করেছেন। কারণ লেখকের উদ্দেশ্য সমষ্টি জীবনকেও চিত্রিত করা। সেজন্যই ভোলা নন্দী ও তার স্ত্রী, বৌমা পাঁচী, মানদার উলং অবস্থার কয়েদী জীবন, উলঙ্গ মা ভূতি ও বাব বছরের ছেলে কানুর সম্পর্কের রুদ্ধশ্বাস আড়ষ্টতা আবদুল আজিজ সুরেন ঘোষদের শোষোণের রূপ, পুলিশ ইন্সপেক্টর সুদেবেরকামার্ত রূপ, প্রভৃতি খন্ডচিত্র গল্পে এসেছে। তবে এই খন্ড চিত্রগুলির মাধ্যমে লেখকের মূল বক্তব্য স্পষ্টরূপে উপলব্ধ

হয়। দুঃশাসনীয় গল্পের উলঙ্গতা আসলে শোষক শ্রেণীকে আঘাত করার প্রতিবাদী অস্ত্রের মতো, তা প্রতিবাদী সবভাবের উন্মোচনের উদ্দীপক মাত্র।

সত্যিই সাহিত্যের জগতে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর একটি স্থায়ী আসন করে নিয়েছেন তাঁর রচিত সাহিত্য সম্ভারের দ্বারা। সাহিত্যের জগতে বাস্তববাদী এই কথা সাহিত্যিকের প্রথম হাতে খড়ি ঘটে 'অতসীমামী' গল্পের মাধ্যমে। তারপর তাঁর লেখনী পাই 'প্রাগতৈতিহাসিক', "সরীসৃপ", "হারানের নাতজামাই", "ছোটবকুলপুরের যাত্রী", "আত্মহত্যার অধিকার", "কে বাঁচায় কে বাঁচে", "কুষ্ঠরোগীর বউ" অজস্র বহু বিখ্যাত ছোটগল্পগুলি।

৯.৪ প্রাগৈতিহাসিক

প্রাগৈতিহাসিক গল্পের কেন্দ্রীয় চরিত্র ভিখু ডাকাত দলের সদস্য। এক স্থানে ডাকাতি করতে গিয়ে দলের সঙ্গীরা ধরা পড়ে। নিজে বর্শার খোঁচায় আহত হয়েও সখম হয় পালাতে। এরপর শুরু হয় তার বেঁচে থাকার নতুন সংগ্রাম। জীবন সংকটের নতুন এক অভিজ্ঞতার মধ্য দিওয়ে সে এগিয়ে চলে। শ্বাপদসংকুল বনের মধ্যে লুকিয়ে থেকে সে বেঁচে ওঠে পেহ্লাদের সহযোগিতায়। এমন এক বনে সে লুকিয়ে থেকেছে বর্ষাকালে যে বনে বাঘ বাস করতে চায় না। জলে ভিজে মশা ও পোকার উৎপাত সহ্য করে জোঁকের যন্ত্রণা ভোগ করেও দুদিন দুরাত্রি এক সংকীর্ণ মাচার উপর ভিখু কাটিয়ে দেয়। তারপর পেহ্লাদের বাড়িতে আশ্রয় পেয়ে সে সুস্থ হয়ে ওঠে, নজর দেয় পেহ্লাদের বউ এর দিকে, তারপর পেহ্লাদ বোনাইয়ের সাহায্যে তাঁকে মেরে তাড়াতে সক্ষম হয়। প্রতিশোধ পরায়ণ ভিখু সেদিনই আগুন ধরিয়ে দেয় পেহ্লাদের বাড়িতে। তারপর শুরু হয় আদিম অভ্যস্ত জীবনের দ্বিতীয় পর্যায়। ক্ষুধাতৃষ্ণায় কাতর ভিখু এরপর ভিক্ষাকেই জীবিকা অর্জনের পথ হিসেবে বেছে নেয়। এই উপায়ে ভালই চলতে থাকে দিনকাল, ধীরে ধীরে উন্নতি হতে থাকে স্বাস্থ্যের। আশানুরূপ ভিক্ষা না পেলে দাতার উপর ক্ষেপে উঠে গালি দিতে থাকে। এক পয়সার জিনিস কিনে ফাউ না দিলে দোকানি মারতে ওঠে। নদীর ঘাটে মেয়েরা স্নান করতে নামলে সেখানে হাজির হয়। মেয়েরা ভয় পেলে

সে খুশি হয়, সরে যেতে বললে সরে না, দাঁত বের করে দুর্বিনীত হাসি হাসে। ভিখুর ভিতর দিয়ে এক আদিম জান্তব প্রবৃত্তিকেই ফুটিয়ে তুলতে চান মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়। নারীবিবর্জিত নিঃসঙ্গ জীবন ভিখুর পক্ষে যেন দুর্বিষহ হয়ে উঠছিল। ভিক্ষাসূত্রেই পরিচয় হয় ভিখারিনী পাঁচীর সঙ্গে। লেখক বর্ণনা করেছেন, 'বয়স তাহার বেশি নয়, দেহের বাঁধুনিও বেশ আছে। কিন্তু একটা পায়ের হাঁটুর নিচ হইতে পায়ের পাতা পর্যন্ত তাহার থকথকে তৈলাক্ত ঘা।' এই ঘাটুকুই তার ব্যবসায়ের পুঁজি। তাই অসুদ দিলে অখনি সারে যে ঘা সেটা সারাতে চায় না।

এই মেয়েটির প্রতি সে আকৃষ্ট হয়। তার সামর্থ্যের আয়ত্বে মনে করে মেয়েটিকে। অবশ্য মেয়েটি তাঁকে গ্রাহ্য করে না। এক জোয়ান দাড়িওয়ালা ভিখারির সঙ্গে ভালোই আছে সে। নানাভাবে ভিখারিনির উপেক্ষা তাঁকে দমাতে পারে না। একই জায়গায় উপার্জন কমে আসলে ভিখু সরে অন্য জায়গায় যায় না। একদিন পাঁচীর থাকার জায়গা দেখে এল। লোহার একটা শিক নিয়ে বসিরে মাথায় ঢুকিয়ে দিয়ে তাঁকে হত্যা করল, এবং তার সমস্ত সঞ্চয় লুট করে পাঁচীকে নিয়ে পাড়ি দিল এক অজানা উদ্দেশ্যে।

গল্পের শেষ অংশে লেখকের বক্তব্য আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে-

'হয়তো ওই চাঁদ আর এই পৃথিবীর ইতিহাস আছে। কিন্তু যে ধারাবাহিক অন্ধকার মাতৃগর্ভ হইতে সংগ্রহ করিয়া দেহের অভ্যন্তরে লুকাইয়া ভিখু ও পাঁচী পৃথিবীতে আসিয়াছিল এবং যে অন্ধকার আহারা সন্তানের মাংসল আবেষ্টনীর মধ্যে গোপন রাখিয়া যাইবে তাহা প্রাগৈতিহাসিক পৃথিবীর আলো আজ পর্যন্ত তাহার নাগাল পায় নাই কোনোদিন পাইবেও না।'

'কল্লোল' পত্রিকা কেন্দ্রিক সাহিত্য ছিল লিবিডোচেতনা অন্তর্ভুক্ত। সেই বিষয়কে কেন্দ্র করেই এ ধরনের আদিম চেতনার গল্প রচনায় নামা। মানুষের আদিমতার মৃত্যু নেই। পাঁচীর স্বামীকে হত্যার মধ্যে দিয়ে সেই আদিম সত্তার জয় দেখানো হয়েছে। এই গল্পে মানিক মনে করছেন মানবচৈতন্যের এই ধারা সুদূর অতীতকাল থেকে বহমান রয়েছে, অনাগত ভবিষ্যতেও তা চলতে থাকে। অন্ন বস্ত্র বাসস্থানের মতো জৌন আকাঙ্ক্ষাও এক মৌলিক চাহিদা। বাংলা কথাসাহিত্যে এই মৌল জীবন আকাঙ্ক্ষা প্রাগৈতিহাসিক

গল্পের আগে এমন তীব্রভাষায় প্রকাশ পায় নি। এদিক থেকে বলা যায় যে মানিক স্বতন্ত্র এক জীবনবোধেরও পরিচয় দিয়েছেন।

তাঁর লেখকসত্তায় রয়েছে 'গরিবের রিক্ত বঞ্চিত জীবনের কঠোর উলঙ্গ বাস্তবতা' সম্পর্কে গভীর চেতনাবোধ। এই বোধেরই প্রকাশ আমরা প্রাগৈতিহাসিক গল্পে দেখতে পাই। বাংলা কথাসাহিত্যে তাঁর আগের লেখকদের কেউ কেউ দারিদ্রতাকে হয়তো খানিকটা চিত্রিত করেছেন, যা শুধু ছবি মাত্র রয়ে গিয়েহিল, বাস্তব জীবনের উপলব্ধি এমনভাবে চিত্রিত আগে কখনও হয়নি। মনস্তত্ত্বকে এমন ভাবে উপস্থাপিত করা যায় এই বিষয় মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের থেকে ভাল কেই বা বলতে পারেন।

৯.৫ ছোট বকুলপুরের যাত্রী

ছোট বকুলপুরের যাত্রী গল্পের শুরু ও শেষ দুটোই ছোটগল্পের আকস্মিক প্রারম্ভ এবং বৈশিষ্ট্যপূর্ণ উপসংহার সূচক। এ গল্পকে স্পষ্টত তিনটি পর্বে ভাগ করা কায়। প্রথম পর্বে দেখা যায় ছোট বকুলপুর যাওয়ার জন্য ছোট একটা রেল স্টেশন। ওই স্টেশনের একটা থমথমে চিত্র। এ থমথমে আতঙ্কজনক পরিবেশের কারণ শ্রমিক অসন্তোষ ও শ্রমিক গ্রেফতার। আর এ শ্রমিক গ্রেফতারের প্রতিবাদে মজুরদের একতাবদ্ধ হওয়া এবং তাদের উপর পুলিশের গুলিবর্ষণ, পরিণামে রক্তপাত। মানিক চরম রাজনৈতিক বর্ণনা দেওয়ার সময়ও শিল্পমনস্কতার পরিচয় গল্পের একটা লাইনেই পাওয়া যায়। 'ওদের মাথার পিছনে দূরে কারখানার উঁচুতে টাঙানো নিঃসঙ্গ আলোটা তার চোখে পড়েছিল, অন্ধকার আকাশে যেন বিনা অবলম্বনে ঝুলিয়ে রাখা হয়েছে।'

কাব্যিক এ বর্ণনায় কারখানার উঁচুতে টাঙানো নিঃসঙ্গ আলো শ্রমিকের জীবনের নিঃসঙ্গতা আর অন্ধকার আকাশ তাদের ভাগ্যের, জীবনের অন্ধকারাচ্ছন্নতার প্রতীকে উপস্থাপিত হয়েছে। এ বর্ণনা পড়লে শ্রমিকের কারখানা জীবনের সমাজ বিচ্ছিন্নতা, রিক্ত বিরিক্ত ঘাম ঝরানো নিয়তির কথা মনে পড়ে।

এ গল্পের দ্বিতীয় পর্বে রয়েছে ছোট রেলস্টেশন থেকে আন্না দিবাকরের ছোট বকুলপুর যাত্রা। তৃতীয় বা শেষ পর্বে দেখা যায় ছোট বকুলপুরে পৌঁছানোর ঠিক অব্যবহিত পূর্বে

আন্না দিবাকরকে বিপ্লবী সন্দেহে পাকড়াও করা। এ গল্পে দিবাকর সমাজের কোন শ্রেণীর প্রতিনিধিত্ব করছে তা আমাদের জানা প্রয়োজন। গল্পের বর্ণনায় রয়েছে দিবাকর ঘনশ্যাম বেটেনট কারখানার মজুর। মূলত ছোট বকুলপুর তার শ্বশুরবাড়ি। সে স্ত্রী-সন্তান নিয়ে ছোট বকুলপুর রওনা হয়েছে শ্বশুর বাড়ির লোকজনদের খবর জানার জন্য। কেননা ছোট বকুলপুরে গ্রামের কৃষকদের আন্দোলন প্রতিবাদের মুখে জোতদার মজুতদার মিলিতভাবে সশস্ত্র পাহারা বসিয়েছে। তবে আমাদের সমাজে যারা কারখানার শ্রমিক তারা মূলত কৃষীজীবী পরিবার থেকেই আগত। একারণে তাদের মনোজগতে কৃষক ও শ্রমিক দুয়েরই সহাবস্থান রয়েছে। মানিকের বর্ণোনায় চমৎকারভাবে এটি উঠে এসেছে –

“তিনজন নেতাকে ধরে ট্রেনে চালান দেবার সময় কয়েক শো মজুর তাদের ছিনিয়ে নিতে এসেছিল। তখন গুলি চলে, রক্তপাত ঘটে। গাড়িতে ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ শোনার পর থেকে দিবাকরের আধাচাষি, আধামজুর প্রাণটা বড়ই বিগড়ে আছে।”

এখানে আধাচাষি আধামজুর কথাটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কেননা বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে, আমাদের সমাজ মূলত আধাসামন্ত আধা বুর্জোয়া এভাবেই বিন্যস্ত। মনের গভীরে এই যে দুটো সত্তার টানাপোড়েন তা আমাদের জীবনকে প্রায়শই দ্বন্দ্বময় অবস্থানের ফেলে দেয়। এ গল্পে ছোট বকুলপুর সন্নিহিত ছোট্ট রেলস্টেশনের দমবন্ধ আতঙ্কিত থমথমে পরিবেশের জন্য দায়ী কারখানার শ্রমিক ধর্মঘটে, ধর্মঘটী তিনজন নেতাকে ধরে ট্রেনে চালান, শ্রমিক প্রতিবাদ এবং তাদের উপর গুলিবর্ষণের ফলে রক্তপাত। অন্যদিকে ছোট বকুলপুরের বাসিন্দাদের মধ্যে হয়তো তৈরি হয়েছে এক ধরনের অস্তিত্ব সংকট। যদিও মানিক এখানে রাজনৈতিক সংকটকে যতটা প্রকটভাবে চিত্রিত করেছেন, ছোটবকুলপুরের অবরুদ্ধ মানুষদের, কৃষকদের হতদরিদ্রদের ও অস্তিত্বসংকটকে সেভাবে বিবৃত করেন নি। তবে এক্ষেত্রেও মানিক বাস্তবতাপূর্ণ বর্ণোনা দিয়েছেন। কারণ যে কোন ঘটনা দূর থেকে শুনলে এক রকম ধারণা পাওয়া যায়, যা বাস্তবে হয়তো সেরকম নয়। ছোট বকুলপুর যে শুধুই একটা অবরুদ্ধ জনপদ তা নয়,

ওই কৃষক অধ্যুষিত ছোট জনপদের অভ্যন্তরে যে প্রতিরোধ উচ্চকিত হয়ের উঠেছে, যাত্রাপথে গাড়োয়ান গগনের মুখ থেকে তা জানা যায় ঃ-

'দূর থেকে তারা শুনেছিল যে ছোট বকুলপুরের অবস্থা অতি শোচনীয়, প্রচন্ড আঘাতে গাঁয়ের গেরস্ত জীবন তছনছ চুরমার হয়ে গেছে। গগনের কাছে শোনা যায়, ব্যাপার ঠিক তা নয়। গোড়ায় গাঁয়ের মধ্যে খুব খানিকটা অত্যাচার হয়েছিল, কিন্তু গাঁয়ের কোন লোক অন্তত দুডজন রাইফেল ছাড়া গাঁয়ের ভেতর ঢুকতেই সাহস পায় না।'

এতকিছুর পরও যেন নিয়তির কাছে পরাজয় মানতে হয় দিবাকরকে। কেননা, ছোটবকুলপুরে যাত্রার পূর্বে রেলস্টেশনে দিবাকর পান কেনার সময় যে কাগজ মুড়িয়ে পান বিক্রেতা তাকে পান দিয়েছিল ঐ ছেঁড়া কাগজটি ছিল একটা ইশতেহার। ঐ নিরেট প্রমাণের কোন প্রয়োজন হয় না; কেবল অজুহাত হলেই হল। একারণে সশস্ত্র পাহাড়াদারদের দল দিবাকরকে বিপ্লবী সন্ধেহ করে। গল্পে শেষের কথোপপকথন তাই গুরুত্বপূর্ণ। দিবাকর বলেঃ

ঈশতেহার? ইশতেহারের তো কিছু জানি না। চার পয়সার পান কিনলাম, পানওয়ালা ও কাগজটাতে জড়িয়ে দিল।

অন্যদিকে তাকে অবরোধকারীদের পালটা সন্দিগ্ধ প্রশ্নঃ 'পানওয়ালা জড়িয়ে দিল না তুমি ভেবে চিনতে পান কিনে ইশতেহারটাতে জড়িয়ে নিলে?'

গল্পের শেশে স্পষ্ট করে এর পরিণোতি টের পাওয়া যায় না। শুধু এটুকু সংকেত পাওয়া যায় যে দিবাকর আন্না ছোট বকুলপুর পৌঁছার পূর্বেই অন্যায়ভাবে ধরা পড়ে।

৯.৬ অনুশীলনী

১) হারাণের নাতজামাই গল্পের কাহিনি আলোচনা করে সমকালীন পরিস্থিতি ব্যাখ্যা কর।

২) দুঃশাসনীয় গল্পে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় যে দুর্ভিক্ষ ও আর্থসামাজিক ছবি দেখিয়ে তার নিরিখে আলোচনা কর।

৩) প্রাগৈতিহাসিক গল্পে ভিখু জীবন বর্ণনা কর।

৪) প্রাগৈতিহাসিক গল্পে যে কামপ্রবৃত্তি ভয়ানক চিত্র অঙ্কিত হয়েছে, ফ্রয়েডীয় তত্ত্বের দৃষ্টিকোণ থেকে আলোচনা কর।

৫) ছোট বকুলপুরের যাত্রী গল্পে সমকালীন রাজনৈতিক পরিস্থিতি গল্পের নিরিখে ব্যাখ্যা কর।

৯.৭ গ্রন্থপঞ্জি

১) চক্রবর্তী, যুগান্তর – মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের শ্রেষ্ঠ গল্প, বেঙ্গল পাবলিকেশন প্রাঃ লিঃ।

২) চৌধুরী, শ্রীভূদেব, - বাংলা সাহিত্যের ছোটগল্প ও গল্পকার, মর্ডাণ বুক এজেন্সি প্রাঃ লিঃ।

৩) দত্ত, বীরেন্দ্র – বাংলা ছোটগল্প প্রসঙ্গ ও প্রকরণ(প্রথম খন্ড), পুস্তক বিপণি।

৪) বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রী শ্রীকুমার – বঙ্গ সাহিত্যে উপন্যাসের ধারা, মর্ডাণ বুক এজেন্সি প্রাঃ লিঃ।

৫) চট্টোপাধ্যায়, তপনকুমার – আধুনিক বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস, প্রজ্ঞা বিকাশ।

এককঃ-১০ মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্বাচিত গল্পের আলোচনা

বিন্যাসক্রম

১০.১ সরীসৃপ গল্পের আলোচনা

১০.২ আত্মহত্যার অধিকার গল্পের কথা

১০.৩ কে বাঁচায় কে বাঁচে গল্পের চিত্রণ

১০.৪ যাকে ঘুষ দিতে হয় গল্পের আলোচনা

১০.৫ শিল্পী গল্পের ভিতরকার কথা

১০.৬ অনুশীলনী

১০.৭ গ্রন্থপঞ্জি

১০.১ সরীসৃপ গল্পের আলোচনা

স্বামী ও শ্বশুরের উৎত্রাধিকারিণী হিসেবে চারু একটি বিরাট বাগান বাড়ি লাভ করেছিল। শ্বশুর ও স্বামীর মৃত্যুর পরে সে আর এই বাড়ি বা বাগান কোনোটাই রক্ষা করতে পারেনি। সব চলে গেল মাঝবয়সী ঝানু কারবারি পাটের দালাল বনমালীর দখলে। বনমালীর পিতা ছিল চারুর শ্বশুর রামতারণের মোসাহেব। চারুর স্বামী ছিল পাগল, তার ছেলে ভুবনও মানসিক বৈকল্যে আক্রান্ত, অপ্রিণোত মস্তিষ্ক। প্রথম যৌবনে বনমালী চারুর প্রতি তীব্র অনুরক্ত ছিল; কিন্তু চারু তখন তাকে পাত্তা তো দেয়ই নি বরং লেখকের ভাষায় ‘চারু তখন তাঁহাকে নিয়া খেলিত’। চারু নিজের স্বাভাবিক যৌনচাহিদাকে সংযত রেখেছিল, নিজেকে সামলাইয়া না চলার দুরন্ত ইচ্ছার সঙ্গে

লড়াই করে বিজয়ী হয়েছিল। পরবর্তীকালে বিধবা ও অসহায় চারু নিজের বাড়ি রক্ষার্থে ও নিজপুত্রের ভবিষ্যৎ স্বার্থে যখন বনমালীকে তুষ্ট করতে চায় তখন সে 'একজন পৌঢ়া নারী'। তার প্রতি বনমালীর সমস্ত আকর্ষণ উবে গেছে। বরং চারুর ছোট বোন পরী তখন বনমালীকে নিজের দিকে আকর্ষণ করতে সক্ষম হয়েছে। পরীর প্রতি বনমালী তখনই আকৃষ্ট হয় যখন সে দেখে বিধবার বেশ ধারণ করায় পরীকে কমবয়সী চারুর মতো দেখাইতেছে। তার ব্যবহার তার মনোবিকার, তার কথা বলিবার ভঙ্গি যেন চারুর যৌবনকাল হইতে নকল করা। বিধবা পরী ওই বাড়িতেই আশ্রয় পায় এবং বনমালীর সঙ্গে তার শারীরিক সম্পর্ক স্থাপিত হয়। বনমালীকে কেন্দ্রে রেখে দুই বোনের পরস্পরের প্রতি ঈর্ষা চরম বিদ্বেষের রূপ নেয়। চারু পরীকে সুকৌশলে হত্যা করতে চায় কলেরায় বীজযুক্ত বাটিতে ঠাকুরের প্রসাদ খেতে দেওয়ার মাধ্যমে। কিন্তু কলেরায় প্রাণত্যাগ করে চারু নিজেই। এবার পরীর পালা। সে চারুর জড়বুদ্ধি ছেলে ভুবনকে চলন্ত ট্রেন থেকে লাফিয়ে পড়ে প্রাণত্যাগ করার নিশ্চিন্ত ব্যবস্থা করে ফেলে। এদিকে বনমালী যথেচ্ছ স্মভোগের পরে পরীকে নামিয়ে দেয় 'এ-বাড়িতে যাঁদের স্থান ঝি চাকরেরও নিচে' তাদের কাতারে। চারুর মৃত্যুর পরে তার ছেলের প্রতি বনমালীর কিছুটা মমত্ব দেখা দিয়েছিল। সেটাও বেশিদিন স্থায়ী হয় নি। তার মা চারুর ছেলের খোঁজ করার কথা বলবে বনমালী শুধু উচ্চারণ করে, 'আপদ গেছে, যাক।'

১০.২ আত্মহত্যার অধিকার গল্পের কথা

আত্মহয়াত্যার অধিকার গল্পে নীলমণীর জীবন যাপনের কোন ব্যবস্থা বা সুযোগ নেই বররমান সামাজিক অবস্থায়। "সকলে যেখানে বাচিতে চায়, লাখ মানুষের জীবিকা একা জমাইতে চায়, কিন্তু কাহাকেও বাঁচাইতে চায় না, সেখানে সে বাঁচিবে কিসের জোরে?" এই খোলাখুলি প্রশ্ন তুলেই গল্পটির বক্তব্যের আবেদন জাগরণ। বর্ষার অত্যাচারে চৈতালী ঘূর্ণীর মুখে ঝরাপাতার মতো ছিন্নভিন্ন নীলমণির নিঃস্ব পরিবার। তবু নীলমণি আজন্ম অরজিত মান-সম্মানের ক্ষয় ক্ষতিয়ান এখনো তলিয়ে দেখতে চায়। "ছেলে মেয়ে বৌকে বর্ষাবাদলে মাথা গুঁজবার ঠাই দিতে পারে না, অত মান অপমান কি জন্যে?" স্ত্রী নিভার এই প্রশ্নে তার মাথায় খুন চাপে, তামাক ফুরিয়ে যাবার সামান্য

ছুতোয় মেয়ে 'শ্যামার' ওপর 'আকাশের বজ্রের মতো' ধমকে ওঠে। অথচ পায়ের নীচে মৃত্যুর সুনিশ্চিত খাদ। তবু বুভুক্ষু ছেলের 'তীরের ফলার মত' কান্না, লঙ্কাবাটার মতো মেয়ের মুখের চাউনী, নিমুনিয়ার সঙ্গে নিভার ব্যকুল কলহ দেখেও সে প্রতিবেশী ধনী সরকারদের আশ্রয়ে যেতে চায়নি। কারণ রাত দুপুরে বিপদে পড়ে আশ্রয় নিতে গেলে বা শিশুর জন্য এক টুকরো শুকনো ন্যাকড়া চাইলে যাঁদের উপেক্ষার আবিল দৃষ্টি সইতে হয় তাদের আশ্রয় তার কাছে অসহ্য। কিন্তু আত্মসম্মান আর টিকে থাকার নূন্যতম প্রয়োজনে শুরু হয়েছে যখন প্রকৃতি আর পরিবেশের সাথে অন্য মানুষগুলোর কবজির লড়াই, পেটের ক্ষুধা, দেহের ক্ষুধা, শীত, বর্ষা, রোগ, বিধাতার অনিবার্য জন্মের বিধান ইত্যাদির চাপে নুয়ে পড়েছে যার দেহ, স্ত্রী পুত্র কন্যার ভরণ পোষণের ভার বইতে না পেরে দারিদ্র্যের আঘাতে দুমড়ে গেছে যে অক্ষম মানুষটির সহজাত কামনা, "বাঁচিয়া থাকাটা শুধু আজ এবং কাল নয়, মুহূর্তে মুহূর্তে নিষ্প্রয়োজন" – সেখানে নীলমণির মান-অপমান জ্ঞানটা যে শেষ পর্যন্ত টিকবে না তা মধ্যবিত্ত পরিবার উদ্ভূত মানিক জানেন। আর এই জানার দুঃসহ জন্ত্রণাতেই এই গল্পের নামকরণ থমকে উঠেছে প্রশ্ন – 'অন্নপূর্ণার ভাণ্ডারে' উপবাসী থাকার চেয়ে শেষে সম্বল আত্মসম্মানকে বন্ধক দিয়ে পঞ্চাশ মেইল গভীর বায়ুস্তরে ডুবে থেকে প্রতি মুহূর্তে দম আটকে মরার চেয়ে হতভাগ্য মানুষটি 'আত্মহত্যার অধিকার' দান কি অধিকতর কাম্য নয়?

১০.৩ কে বাঁচায় কে বাঁচে গল্পের চিত্রণ

নানাবিধ সামানিজ ঘটোনায় ও পারিপার্শ্বিক পরিমন্ডোলের পরিবর্তনশীল চাহিদায় মধ্যবিত্তমনের রূপান্তর মানিক বন্দ্যোপাধায়ের গল্পের লক্ষ্য করা যায়। তিনি বলেছিলেনঃ "মধ্যবিত্ত ভদ্রদের পরিণাম জানতেম না বটে; তবে পচা ভদ্রেতর মিথ্যা খোলস খুলে সবাই ছোটলোক হোক এ পরিণাম যে কামনা করতাম আমার অনেক গল্পেই তা ঘোষোণা করবার চেষ্টা করেছি। সেরকম ধরনের একটি গল্প 'কে বাঁচায় কে বাঁচে'। বিচিত্র এক আত্মপ্রায়শ্চিত্তের কাহিনি। অফিসে যাবার পথে 'অনাহারে মৃত্যু' প্রথম দেখেই মৃত্যুঞ্জয়ের মধ্যে আত্মগ্লানি শুরু। তখন থেকেই "ভাবছি আমি বেঁচে

থাকতে যে লোকটা না খেয়ে মরে গেল, এ অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত কি? জেনে শুনে এতকাল চারবেলা করে খেয়েছি পেট ভরে ধিক্, শত ধিক্ আমাকে।"

এই আবেগের চাপ জত বেড়েছে বিবেকের দুঃসহ উত্তাপে তত পুড়েছে বলে সহকর্মীর কাছে উপেক্ষিত মানবসভ্যতার সবচেয়ে প্রাচীন সাওবচেয়ে পচা ঐতিহ্য আদর্শবাদের কল্পনা –তাপস এই মানুষট। সহকর্মী নিখিলের মতো রিলিফ ফাণ্ডে নামমাত্র টাকা পাঠিয়ে কিংবা বেঁচে থাকতে জতটুকু খাই ইত্যাদি সুবিধেবাদী সংসারী গৃহস্থের সান্ত্বনা বা পচা ভদ্রতার বুলি আউড়ে মৃত্যুঞ্জয় নিজের কাছে এবং নিরস্ত্র মানুষগুলোর কাছে অনপরাধ থাকতে পারে নি। পারে নি তার স্ত্রী পর্যন্ত

"ছেলে মেয়েগুলির জন্য আমার ভাবনা হয় না। কেবলি মনে পড়ে ফুটপাতের ওই লোকগুলির কথা।" মাইনের সব টাকা রিলিফ ফাণ্ডে দিয়ে, তার 'আমার টুলুর মার এক বেলার ভাত বিলিয়ে' দিয়েও যথেষ্ট হয়নি তার কাছে, অফিস ছেড়ে "পাড়ায় পাড়ায় লঙ্গরখানা খুঁজে বার করে অন্নপ্রার্থীর ভিড় দেখে" তাদের মুখে এক ভাগ্যের কথা দুখের কাহিনি শুনে শুনে একদিন শুনে একদিন মৃত্যুঞ্জয় সবেচ্ছায় তাদের পাশে, তাদের বেশেঃ 'গাঁ থেকে এইছি। খেতে পাইনে বাবা। আমায় খেতে দাও।'

একথা ঠিক, আমাদের দেশের মধ্যবিত্ত জন্ম থেকেই আকশ আলো করা ফুল। সে মাটি থেকে প্রাণরস সংগ্রহ করতে পারতো সেই ব্রাত্য জনজীবনের সঙ্গে ভূমিলগ্ন হয়নি তাদের ভূমিকা। প্রকৃতপক্ষে, মানিকের গল্পেই মধ্যবিত্ত মানুষেরা প্রথম স্বেচ্ছাকৃত আত্মবিলোপের মাধ্যমে সর্বহারা জীবনসংগ্রামে অংশী ও সঙ্গী হয়েছে।

১০.৪ যাকে ঘুষ দিতে হয় গল্পের আলোচনা

যুদ্ধবিধবস্ত দেশে পুঁজিপতি হবার চেষ্টায় স্ত্রীকে শুদ্ধ সঁপে দিতে হয় তাকেই "যাকে ঘুষ দিতে হয়।" অথচ গল্পের নায়ক মাখন ছিল মপধ্যবিত্ত ঘরের "পরীক্ষায় ভাল পাশ করা গরীবের ছেলে"। গল্পকার দেখিয়েছেন, বিবেকার্ত মধ্যবিত্তের মূল্যবোধ ধবসে পড়ে যে পরিবেশের চাপে, তার প্রথম আঘাত আসে পরিবারের কারণে। সুশীলা জানতো বড় হবার টাকা রোজগার করবার ক্ষমতা মাখনের আছে, আর "তাই খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে তোমায়

দিকটিও তুলে ধরেছেন লেখক উভয়ের পারস্পরিক অন্তবিশ্লেষণেঃ যেমন ‘ওমা, এত ভাল ছেলের চাকরি কি না একশ টাকার!’ কত অবজ্ঞা, অপমান, লাঞ্ছনা গঞ্জনা স্বামীকে দিয়েছে সুশীলার মনে পড়ে। মনে পড়ে মাখনের “সুশীলের আগের ব্যবহার”। অথচ আজ সেই স্ত্রী গলায় অন্য সুর, চোখে অন্য রঙ। দামী মোটরে চড়ে হাওয়া খেতে বেরিয়ে সুশীলার মধ্যে জেগেছে একদিকে, “বাজে মোতর গাড়ির চলা দেখে মুখ বাঁকানো সুখ”, অন্যদিকে ট্রামের হাতল ধরে আর বাসের পিছনে মানুষকে ঝুলতে দেখে সুশীলার মায়া হয়, এক অদ্ভূত মায়া! জাতে গর্ব বেশী। ” অথচ সে মধ্যবিত্ত ভাল ঘরের মেয়ে। তবু মাত্র তিন বছরে তার স্বামী ট্রামে ঝোলার অবস্থা থেকে দামী মোটরে চড়ার অবস্থায় পৌঁছেছে। আর এর মূলে আছেন কনট্রাক্টর দাসবাবু, যাকে দেখে সুশীলার মনে হয়, শ্বশুর ভাসুর ইত্যাদি গুরুজনের চেয়েও ইনি গুরুজন। ইনি দেবতার সামিল। অর্থের প্রয়োজনে পারিবারিক সম্পর্কগুলির রূপান্তরের দিকে , ছিন্নযোগ মূল্যবোধের দিকে লেখকের আগাগোড়া ব্যঙ্গের লক্ষ্যবস্তু। কেননা, “দাস সাহেবের দৃষ্টি তার মুখে বুকে কোমরে চলাফেরা করছে টের পায় সুশীলা, যেমন তেমনি আপনার স্ত্রী, দাসের এই ইঙ্গিতময় প্রশ্ন শুনে তা প্রমাণের জন্য পরণের বেনারসী রঙের মতো, সলজ্জ ভঙ্গীতে বৌসুলভ আচরণ করা, সোয়া লাখ টাকার কনট্রাক্ট পাওয়া যাবে শুনে নিঃশ্বাস আটকে যাওয়া, দাসের বাড়িতে ঘরের সাজসজ্জা আর আসবাবপত্র দেখে নিজেদের বাড়িতে বিশেষত্ব আমদানির চিন্তা, দাস ও মাখনের কন্‌ট্রাক্ট- সংক্রান্ত কথাবার্তা গভীর আগ্রহের সঙ্গে শোনবার ও বোঝবার চেষ্টা, কালীঘাটে পুজো দিয়ে যাবার প্রস্তাব (ভগবানকে ঘুষ দেওয়ার ইঙ্গিত?) ইত্যাদির মাধ্যমে গল্পকার যেন চূড়ান্ত ব্যঙ্গে চরিত্রটির লোভের স্বরূপকে উদ্‌ঘাটিত করেছেন। স্বামীর সক্রিয়তা নিশ্চয়ই আছে, তবু মনে হয় এই লোভই যেন অনিবার্য নিয়তি হয়ে অজগরের সামনে এনে দাড় করিয়েছে। তার পরিচয় ধরা পড়েছে গল্পের শেষাংশে। মাখন কনট্রাক্ট লাভ করার তৃপ্তিতে এবং দাসবাবু কাছে সুশীলাকে ছেড়ে যাওয়ার যন্ত্রনায় ট্রক্সি ড্রাইভারকে বলেছে জোরে – আরো জোরসে গাড়ী চালাতে!

১০.৫ শিল্পী গল্পের ভিতরকার কথা

মানিক বন্দ্যোপাধায়ের এমনই একটি বহু বিখ্যাত ছোটগল্প "শিল্পী"। "পরিস্থিতি"(১৯৪৬) সংকলনের অন্যতম স্মরণীয় গল্প হল "শিল্পী"। গল্পটিতে লেখক মদনের মর্ম গাথাকে ভাশাপদান করেছেন, মদনকে করে তুলেছেন সর্বদেশের সর্বকালের একজন যথার্থ শিল্পী।

"পরিস্থিতি" গল্পসংকলনের প্রকাশকাল ১৯৪৬। সালটি দেখেই আমাদের চোখের সামনে ভেসে ওঠে শৃঙ্খলিত ভারতমাতার বুকের সন্তানদের এক রণবিক্ষুব্ধ চেহারা। ১৯৪২-এ আগষ্ট আন্দোলন, ১৯৪৫ –এ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, চারিদিকে হাহাকার, মন্বন্তর, মানুষের প্রতিবাদী মনোভঙ্গি, বিপ্লবী চেতনা, গণ অভ্যুত্থান সবকিছু মিলিয়ে চারিদিকে একটি বিশৃঙ্খলাময় পরিস্থিতি। সেসময় সাহিত্যিক মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় পরিপূর্ণভাবে মাকর্সবাদে বিশ্বাসী একজন কথাকার। ১৯৪৪ খ্রীষ্টাব্দে তিনি ভারতীয় পরিপূর্ণভাবে ছিলেন একজন মাকর্সবাদী কথাকার। তখনকার রচিত সাহিত্যেও তার প্রভাব পড়েছে। বাস্তবে ঘটে যাওয়া ঘটনাগুলি লেখকের মনে সক্রিয়ভাবে প্রভাব বিস্তার করেছিল। সে সময়কার প্রতিবাদী মনোভঙ্গি, বিপ্লবী চেতনা, গণ অভ্যুত্থান ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন ইত্যাদির প্রভাব মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের চিন্তাশক্তিতে থাকার ফলে তাঁর রচিত গল্প উপন্যাসেও তা সক্রিয় থাকে। "পরিস্থিতি" গল্প সংকলনের বারোটি গল্পের মধ্যে 'শিল্পী' গল্পটি অষ্টম স্থানে রয়েছে। 'শিল্পী' গল্পটিতে তৎকালীন আকালের দিনের প্রসঙ্গ আছে। চারিদিকে সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী দেশীয় আন্দোলন, রাজনৈতিক তৎপরতা, গান্ধিজীর বিয়াল্লিশের "ভারত ছাড়ো" আন্দোলন এসব গল্পকারের মানসপটে সুদৃঢ়ভাবে সক্রিয় ছিল। 'শিল্পী' গল্পের নায়ক মদন তাঁতি ও তার গ্রামের প্রতিবেশি তাঁতি মানুষদের সমবেত ঐক্যচেতনার মধ্যেও এই সক্রিয়তা লক্ষ্য করা যায়।

গল্পের শুরুতেই আমরা পাঠকেরা লক্ষ্য করি যে টানা সাতদিন তাঁত না চালিয়ে গল্পের নায়ক মদন তাঁতির হাতে- পায়ে, কোমরের পিঠে কেমন আড়ষ্ট মতো বেতো ধরেছিল, তাঁতে গাঁটে গাঁটে ঝিলকমারা কামড়ানি। আকালের দিনে প্রতিবাদী মনোভাবসম্পন্ন

মদন তাঁতি সহ অন্যান্য তাঁতিরা প্রায় উপোসে দিন কাটাতে বাধ্য হচ্ছে। শুধুমাত্র বৃন্দাবন ও কেশব এই প্রতিবাদী আন্দোলন নেই, তারা তাঁত চালায়। মদনের স্ত্রী অন্তঃসত্ত্বা, অভাব-উপোসে দুর্বল। অর্থ উপয়ার্জন করতে না পারায় সংসারে অশান্তি, ক্রমে মদনের মেজাজও হয় রুক্ষ। সুতরাং ব্যবসার মধ্যসত্ত্বভোগী ভুবন জোগান দিয়ে তাঁত চালানোর প্রস্তাব দিলেও মদন স্বীকার করে না। তাঁদের বক্তব্য মদন যখন গামছা বুনবে সূর্য তখন পশ্চিমে উঠবে। প্রতিবেশী তাঁতিদের জিজ্ঞাসু দৃষ্টি মদনের মানসিকতাকে চঞ্চল করে তোলে। এক সময় ভুবনের দেওয়া সুতোয় তাঁত চালানোর কথা চিন্তাও করে সে। কিন্তু সে সুতো যে অত্যন্ত মোটা, সেই মোটা সুতো দিয়ে কীভাবে মদন ভালো কাপড় বুনবে। অপমানিত বোধ করে মদনের শিল্পসত্ত্বা। একদিকে স্ত্রী ও সংসারের সকলের উপোসের অসহায়তা অন্যদিকে মদনের সাত্ত্বিক শিল্পসত্ত্বা –এ দুয়ের দ্বারা মদন গভীর দ্বন্দ্বের মধ্যে থাকে।

“সুতো দেখে কান্না আসে মদনের। এই সুতো দিয়ে তাকে ভালো কাপড়, দামী কাপড় বুনে দিতে হবে। এর চেয়ে কেশবের মত গামছাই নয় সে বুনত, লোকের মদন তাঁতি গামছা দায়ে পড়ে, কিন্তু যা-তা ওঁচা কাপড় বোনেনি। সকালে পায়ে যেমন খিঁচ ধরেছিল তেমনি ভাবে কি যেন টেনে ধরে তার বুকের মধ্যে। ট্যাঁকে গোজা দাদনের টাকা দুটো চ্যাঁকা দিতে থাকে চামড়ায়।...”

‘শিল্পী’ গল্পের কেন্দ্রীয় তথা মুখ্য চরিত্র মদন। পরিবারের প্রতি দায়বদ্ধতা, তাঁতি সমাজের প্রতি দায়বদ্ধতা আর নিজের শিল্পসত্ত্বার প্রতি নিষ্ঠা – এই তিনের সমন্বয়ে মদন তাঁতি চরিত্রটিকে লেখক সৃজন করেছেন। মদনের পরিবারে আছে তার মা, তার ন-মাসের অন্তঃসত্ত্বা স্ত্রী, দুবছরের একটি ছেলে, একটি চার বছরের মেয়ে সহ তার মাসি। সাত দিন টানা তাঁত না চালিয়ে সংসার অচল। প্রতিবেশিনী উদি মদনের বউকে লুকিয়ে চাল ডাল দেয়। এই উদির কথার মাধ্যমেই মদনের সাংসারিক দুরবস্থার কথা আমরা জানতে পারি,

“এক বেলা এক মুঠো ভাত পায়তো তিনবেলা উপোস। এমনি চলছে দুমাস।”

এ হেন সাংসারিক অবস্থাতেও মদন তাঁতি কিন্তু নিজের সিদ্ধান্তে অটুট থাকে। ভুবনের থেকে সে সুতো পায়, কিন্তু সে সুতো যে নিম্নমানের, সে সুতো দিয়ে সে কাপড় বুনবে কীভাবে? চলতে থাকে এক সুতীব্র মানসিক দ্বন্দ্ব। একদিকে পরিবারের বেহাল অবস্থা অন্যদিকে শিল্পের প্রতি শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা – এ দুয়ের টানাপোড়েনে আমরা মদন তাঁতির অসহায় রূপটি দেখতে পাই,

"কিন্তু এদিকে হাত না চালিয়ে চালিয়ে সর্বাঙ্গ আড়ষ্টমত ব্যথা, পেটে খিদেটা মরে মরে জাগছে বারবার, বৌটা গোঙ্গাচ্ছে একটানা। কি করবে মদন তাঁতি?"

বেঁচে থাকার জন্য নূন্যতম খাদ্যটূকু সংগ্রহে অক্ষম মদন তাঁতি মানসিক দ্বন্দ্বের টানাপোড়েনে জর্জরিত। মদনের জীবন সংগ্রাম যেন সমগ্র তাঁতি সম্প্রদায়ের জীবন সংগ্রাম। ভুল জানে, মদনকে কিস্তিতে বাজিমাত করতে পারলেই তাঁতি সমাজের অনেকেই ভুবনের ফাঁদা জালে ধরা দেবে অর্থাৎ দাদনের অল্প টাকার বিনিময়ে ভুবনকে কাপড় বুনে দেবে। আর তাতেই মধ্যসত্ত্বলোভী ভুবন আরও লাভবান হয়ে উঠবে। আর তাই উদিকে মদনের সংসারের খবরাখবর নিতে পাঠায়। এই উদি হল জোগাজোগের মাধ্যম। মদনের হাল চালের খবর নিয়ে ভুবনকে দেওয়াই তার কাজ। এই উদিকে একপ্রকার দূত চরিত্র বলা যায়। এখানে উদি ভুবনের দূতী রূপেই কাজ করেছে। মদন যখন যন্ত্রণায় কাতরাচ্ছিল, তখন উদিই হয়তো ভুবনবাবুকে মদনের কাছে পাঠিয়েছে। লেখক জানিয়েছে –

"সাত দিনের তাঁত বন্ধ মদনের, বৌটা তার ন'মাসের পোয়াতি, না খেয়ে তার ঘরে পাছে কেউ মরে যায় উদির এই ভাবনা হয়েছে, জানা গেছে কাল কিছু চাল আর ডাল সে চুপি চুপি দিয়েছে কাল মদনের বউকে, চুপি চুপি শুধিয়েছে মদনের মতি গতির কথা, সবার মত মুজরি নিয়ে সাধারণ কাপড় বুনতে মন হয়েছে কিনা মদনের। কেঁদে উদিকে বলেছে মদনের বউ, না, একগুয়েমী কাটেনি।"

লেখকের এই বক্তব্যের দ্বারা আমরা যেমন উদির মত কাজ উদ্ধারের মাধ্যমে খুঁজে পাই তেমনি দৃঢ়চেতা মদনকে খুঁজে পাই। এই মদন তাঁতিকে আমরা একপ্রকার জেদী, একগুয়ে চরিত্ররূপে গণ্য করতে পারি। কিন্তু তার এই জেদ, একগুয়েমিঈর দ্বারা

আমরা মদনের শিল্পসত্তার প্রতি গভীর মমত্ব বোধকেই খুঁজে পাই, খুঁজে পাই শিল্পের প্রতি শ্রদ্ধা ও সম্মানবোধকে। অসহায় মদন তাঁতির সংসারের এক বেলা ভাত জোটে তা তিনবেলা উপোস। এ হেন অবস্থা মদন থাকে শান্ত হয়ে। কিন্তু এরই মধ্যে ভুবনের পাঠানো সুতো পেয়ে গভীর মানসিক দ্বন্দ্বে জর্জরিত হয়। দাদনের টাকা দুটো মদনের মর্মে আঘাত করতে থাকে। কিন্তু বেরোজগার মদন তাঁতির সাতদিন তাঁত না চালিয়ে গাঁয়ে আড়ষ্ট মত ব্যথা,

“কিন্তু এদিকে হাত না চালিয়ে সর্বাঙ্গ আড়ষ্ট মত ব্যথা, পেটে খিদেটা মরে মরে জাগছে বার বার, বৌটা গোঙ্গাচ্ছে একটানা।”

এহেন অবস্থাতেও মদন কিন্তু থাকে অবচল। জীবনে মদন পারিবারিক দায়িত্ব-কর্তব্য বোধ থেকে নিজের শিল্পসত্তার প্রতি শ্রদ্ধা বড় করে দেখে। এখানেই মদন তাঁতির স্বতন্ত্রতা। ব্যক্তিস্বার্থ অপেক্ষা সমষ্ঠিগত স্বার্থ বড় হয়ে ওঠে মদনের কাছে। সুতোর অভাবে যখন তাঁতিপাড়ার সমস্ত তাঁত থমথম করছে তখন তাঁত চলছে শুধু মাত্র কেশব আর বৃন্দাবনের মত মদন তাঁত চালাতে পারেনা। কারণ তার দায়িত্ববোধ শুধুমাত্র ব্যক্তিজীবন নয়, তার দায়িত্ববোধ নিজের শিল্প চেতনার কাছে। আর সেই একনিষ্ঠ দায়িত্ব কতর্ব্যবোধের প্রমাণ পাই আমরা গল্পের অন্তে থাকা উক্তিতে,

“বেইমানি করব তোমাদের সাথে কথা দিয়ে?” – এই উক্তি মদনের শিল্পচেতনারই স্বার্থক রূপায়ণ। আর তাই সে ভুবনের দেওয়া সুতো দিয়ে কাপড় বোনেনি। সারারাত সে খালি তাঁত চালিয়েছে তখন মদনের তাঁত ঘরের “ঠকাঠক, ঠকাঠক” শব্দ শুনে গোটা তাঁতি পাড়ার বিশ্বাস মদন যেদিন গামছা বুনবে সূর্য সেইন পশ্চিম উঠবে সেই মদন কি সত্যিই ভুবনের সুতো নিয়ে অল্পটাকার দাদনের বিনিময়ে তাঁত বুনছে? সমস্ত তাঁতি পাড়ার চোখে এক তীব্র করুণ জিজ্ঞাসা। মদনের তাঁত চালানোর শব্দ উদির ঘর ভেদ করে বৃন্দাবনের ঘর পর্যন্ত পৌছাতে থাকে। যে ভুবন ছলা-কলার সাহায্যে মদনকে দিয়ে তাঁত বোনাতে চায় সেই ভুবন পর্যন্ত আশ্চর্য হয়ে যায়। উদিও মদনের তাঁত চালানোর শব্দ শুনে অবাক হয়ে যায় এবং বলে,

‘ও খাটি গুণী লোক, ও সব পারে।’

ভয়ে বিস্ময়ে কান পেতে থাকে উদি। রাতদুপুরে বৃন্দাবন ছেলে কেশবকে ডেকে জিজ্ঞেস করে মদন তাঁত বুনছে কি না? এ যেন বিশ্বাস ও অবিশ্বাসের এক আবেগঘন মুহূর্ত। সকলের একটাই জিজ্ঞাসা মদন কি তবে সত্যিই ভুবনের সুতো দিয়ে তাঁত বুনছে? ভোরবেলা ঘুম ভেঙ্গেই উদি ছুটে যায় মদনের কাছে। মদনকে ডেকে তুলে আগ্রহের সঙ্গে বলে যে মদন কতটা তাঁত বুনেছে। মদন উদিকে নিয়ে গিয়ে তার তাঁতঘর দেখায়। ফাঁকা শূণ্য তাঁতঘর দেখে থ বনে যায় উদি। সুতোর বান্ডীল যেমন ছিল তেমনই পড়ে আছে। সুতো আর দাদনের টাকা দুটো মদন উদির হাতে তুলে দেয়। তাঁতি পাড়ায় সকলে যখন জিজ্ঞাসু নয়নে তাঁত বোনার সম্পর্কে প্রশ্ন করে মদন বলে যে সে খালি তাঁত বুনেছে। ভুবনের সুতো নিয়ে তাঁত বোনার মত বেইমানি কাজ মদন করবে না। মদন নিজের পরিবার, দায়িত্ব – কর্তব্য প্রভৃতির উর্দ্ধে উঠে যায়, জয়ী হয় মদনের শিল্পসত্ত্বা।

“শিল্পী” গল্পটি শুধুমাত্র বাংলার তাঁত শিল্পকে বাঁচানোর নয়, এ গল্পে রয়েছে সর্বহারা মানুষদের ঐক্যবদ্ধ সংগ্রমাএর কথা। গল্পের কেন্দ্রে থাকা মদন তাঁতির মাধ্যমে পারিপার্শ্বিক সংকটময় অবস্থা ফুটে উঠেছে। সুতো না পাওয়ার ফলে তাঁত চলে না, বেশি দামে সুতো কিনে তাঁত চালাতে নারাজ গ্রামের সাধারণ খেটে খাওয়া ছাপোসা তাঁতিরা। মধ্যসত্ত্বভোগী দালাল শ্রেণীর মানুষ ভুবন বেশি দামে সুতো দিতে চাইলে অসহায় তাঁতিরা সে সুতো নিতে অস্বীকার করে। কিন্তু এছাড়া আর একটী সমস্যা আছে। অন্যান্য তাঁতিদের সাধারণ ওচা কাপড় ও গামছা বুনতে যেখানে কোনো সমস্যা নেই সেখানে সূক্ষ্ম সুরুচিসম্মত কাপড় তৈরিতে উত্তরাধিকার সূত্রে মদন একজন যথার্থ শিল্পী। আর তাই মদন তার শিল্পের মান নামতে তীব্রভাবে অনিচ্ছুক। আর সেই কারণেই গল্পের পরিসমাপ্তিতে আমরা দেওয়ার জন্য। শৈল্পিক সত্ত্বায় জয়ী হয় মদনের শিল্পসত্ত্বা। এখানেই গল্পটি একটি বিশেষ মাত্রা পেয়েছে। হয়ে উঠেছে মদনের শিল্পসত্তবার এক আশ্চর্যসুন্দর মর্মগ্রাহী আলেখ্য।

১০.৬ অনুশীলনী

১) সরীসৃপ গল্পের নিরিখে নামকরণের সার্থকতা বিচার কর।

২) শিল্পী গল্পের প্রেক্ষিতে শিল্পীসত্তার কোন বিশেষ দিক লেখক দেখাতে চেয়েছেন তা আলোচনা কর।

৩) কে বাঁচায় কে বাঁচে গল্পে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির শিক্ষা কীভাবে গল্পকার দিতে চেয়েছেন আলোচনা কর।

৪) যাকে ঘুষ দিতে হয় গল্পের আলোচনা করে পরিবেশ ও সমকালের চিত্র তুলে ধর।

১০.৭ গ্রন্থপঞ্জি

১) চক্রবর্তী, যুগান্তর – মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের শ্রেষ্ঠ গল্প, বেঙ্গল পাবলিকেশন প্রাঃ লিঃ।

২) চৌধুরী, শ্রীভূদেব, - বাংলা সাহিত্যের ছোটগল্প ও গল্পকার, মর্ডাণ বুক এজেন্সি প্রাঃ লিঃ।

৩) দত্ত, বীরেন্দ্র – বাংলা ছোটগল্প প্রসঙ্গ ও প্রকরণ(প্রথম খন্ড), পুস্তক বিপণি।

৪) বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রী শ্রীকুমার – বঙ্গ সাহিত্যে উপন্যাসের ধারা, মর্ডাণ বুক এজেন্সি প্রাঃ লিঃ।

৫) চট্টোপাধ্যায়, তপনকুমার – আধুনিক বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস, প্রজ্ঞা বিকাশ।

উপসংহার

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়কে কেন আমাদের প্রয়োজন? তার নাম কি শুধু বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসের কালানুক্রমিক রচনা করার জন্যই প্রয়োজন? তার রচনাবলী কি শুধু আমাদের শিক্ষায়তনের প্রতিষ্ঠানগুলোর বাংলা স্নাতক ও স্নাতকোত্তর ডিগ্রি ধারণের সিলেবাসভিত্তিক পড়াশুনার গণদির নিরিখেই বিচারের প্রয়োজন। নাকি আজ এই সময়

তার সাহিত্য ও প্রজ্ঞার দৃষ্টির প্রবহমান জীবনের প্রতিটি আঙ্গিকে আমাদের প্রেরণা ও মূল্যবোধের পাঠ পড়িয়ে চলেছে। মনস্তাত্ত্বিক ও বাস্তববাঁদি মানসিকতা যে জীবনে ও চর্যায় কতটা গুরুত্ব রাখে সেটা বুঝে ওঠা জরুরি।

এককঃ-১১ সতীনাথ ভাদুড়ী - গল্প সাহিত্যের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি ও লেখক সত্তা

বিন্যাসক্রম

১১.১ ভূমিকায় সতীনাথ ভাদুড়ী

১১.২ জন্ম-শিক্ষা- রাজনৈতিক জীবন

১১.৩ গল্পসাহিত্যের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি ও লেখকসত্তা

১১.৪ অনুশীলনী

১১.৫ গ্রন্থপঞ্জি

১১.১ ভূমিকায় সতীনাথ ভাদুড়ী

"দেশ সাহিত্যিক আর কবি সচেতন হয় ঠিক কবি বা লেখকের মৃত্যুর পর। মৃত্যু একটা 'Rude shock' দিয়ে লোককে সচেতন করিয়ে দেয়, একটু অনুতাপ, একটু ভাবের উপর বুঝি বা অবিচার করা হয়েছে। মৃত্যুর অব্যবহৃত পরই রবীন্দ্রপুরস্কার পেয়েছেন বিভূতি বন্দ্যোপাধ্যায়, নরসিংহ দাস প্রাইজ পেয়েছেন মোহিতলাল – ভারত সরকারের 'Academy Prize' পেয়েছেন জীবনানন্দ দাশ – (ব্যক্তিগত দিনলিপি)"

বিগত লেখকদের সম্পর্কে সতীনাথ ভাদুড়ির এই ব্যঙ্গ তীক্ষ্ম সত্য ভাষণের দুর্ঘটনা সৌভাগ্যক্রমে তাঁর জীবনে দেখা দেয় নি। বরং প্রথম উপন্যাস জাগরী প্রকাশ মাত্রই রবীন্দ্র পুরস্কারে সম্মানিত হয়। তবু নামের মোহ, যশের আশা, প্রশংসা বা সম্বর্ধনা, উপহার সম্পর্কে তিনি একেবারেই নিরাসক্ত ছিলেন। এই প্রবাসী বাঙালি লেখক সম্পর্কে সৈয়দ মুজতবা আলির মন্তব্য – "তিনি লেখকের লেখক।" কথাটি বাংলা সাহিত্যে তাঁর অনন্য ভূমিকা রচনা করে। তাঁর সাহিত্য সৃষ্টির কাল স্বল্প(১৯৪৮-১৯৬৫),

গল্প উপন্যাসের সংখ্যা নাম মাত্র। অথচ বিষয় সম্পর্কে তাঁর বিদগ্ধ মানসিকতা সমাজ প্রদর্শন সম্পর্কে গভীরতর চিন্তা ভাবনা, আঙ্গিক নিয়ে নিত্য নব পরীক্ষা প্রমাণ করে সতীনাথ স্বল্পতম সৃষ্টি করেও বিরলতম শিল্পী।

১১.২ জন্ম-শিক্ষা- রাজনৈতিক জীবন

সতীনাথ ভাদুড়ি মুখ্যত প্রবাসী লেখক। অবশ্য তাঁর পরিবারের আদি নিবাস ছিল নদীয়ার কৃষ্ণনগর। কিন্তু তাঁর পিতা ইন্দুভূষোণ ভাদুড়ি আইন ব্যবসার সূত্রে আগমন করেন বিহারের এক সুদূর অঞ্চল পূর্ণিয়ায় ১৮৯৬ সালে। এই পূর্ণিয়ায় ভট্টা বাজারে ১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দে সতীনাথের জন্ম হয়। ১৯২৮ খ্রীঃ মা রাজবালা এবং দিদি করুণাময়ীর সাতদিন আগে ও পরে মৃত্যু ঘটে। পিতা ইন্দুভূষণের অভিজাত গম্ভীর ব্যবহারে সতীনাথ প্রথম থেকেই নিঃসঙ্গ এবং অন্তর্মুখিন। তাঁর বাল্য শিক্ষা, আইন কর্ম রাজনীতিতে যোগদান, সাহিত্যসাধনা, এমনকি মৃত্যুও পূর্ণিইয়া জেলাতেই নিবদ্ধ থাকে। ১৯২৪ খ্রীঃ ডিভিসনার স্কলারশিপ নিয়ে ফাস্ট দিভিশনে ম্যাট্রিক পাশ, ১৯২৬ এ পাঠনা সায়েন্স কলেজ আই এস সি, ১৯২৮ এ অর্থনীতিতে অনার্স নিয়ে বিএ, ১৯৩০ এ অর্থনীতিতে এম এ । ১৯৩১ এ পাটনা ল কলেজ থেকে বি এ পাশ ওকালতিতে যোগদান করেন। ১৯৩২ থেকে ১৯৩৮ পর্যন্ত আওইন ব্যবসায় আত্মনিয়োগ করেন।

সতীনাথের পূর্ণিয়ার পরিবেশ ও জনজীবন সম্পর্কে কৌতূহল, গ্রামীণ জীবন ও সমাজের বিভিন্ন শ্রেণির মানুষ সম্পর্কে অভিজ্ঞতা, তাঁর রাজনৈতিক সচেতনতা সূত্রে প্রাপ্ত হয়। ১৯৩৪ খ্রীঃ গান্ধিজি পূর্ণিয়ায় নওরত মাঠে ভাষণ দিতে আসেন। এখান থেকে সতীনাথের রাজনৈতিক জীবনের সূচনা। প্রথমে সঙ্গীদের নিয়ে ভট্টা বাজারে মদের দোকানে পিকেটিং, পুলিশের সঙ্গে বাদ-প্রতিবাদ, নিজের পুরোনো জেলা স্কুলে ইংরেজি শিক্ষা বন্ধের জন্য পিকেটিং, গ্রন্থাগার স্থাপন, সমাজ সেবা ইত্যাদি কাজে আত্মনিয়োগ করেন। তারপর ১৯৩৯ খ্রীষ্টাব্দের ২৪ সেপ্টেম্বর সর্বজন শ্রদ্ধেয় সর্বোদয় নেতা বিদ্যানাথ চৌধুরীর টিকাপট্টির আশ্রমে যোগ দেন। সংকল্পে সাধ্নায় জীবনাচরণে কংগ্রেসি আদর্শের পূর্ণ পরিচয় দিয়ে পূর্ণিয়ার প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চলে পর্যন্ত ভাদুড়ীজী নামে

খ্যাত হন। কারাবাস করেন তিনবার – ১৯৪০ জানুয়ারিতে ব্যক্তিগত সত্যাগ্রহ করে হাজারিবাগের জেলে ১৯৪১ এ ছয় মাসের জন্য তারপর কংগ্রেস স্যোসালিস্ট পার্টির হয়ে গোপন সংগঠন, অস্ত্র সংরক্ষণ ইত্যাদি কাজের অভিযোগে ১৯৪২-১৯৪৪ খ্রীঃ পর্যন্ত ভাগলপুর সেন্ট্রাল জেলে জীবন অতিবাহিত করেন। পূর্ণিয়ার জেলা কংগ্রেসের সম্পাদক হয়ে ১৯৪৭ পর্যন্ত তিনি ছিলেন সক্রিয় কর্মী। তবে কংগ্রেসি হয়েও তিনি স্যোসালিস্ট কার্যকলাপে ছিলেন অধিকতর আস্থাবান। তাঁর বন্ধু বীরেন ভট্টাচার্যের স্মৃতিচারণায় জানা যায় –

"তিনি মনে প্রাণে স্যোসালিস্টদের পক্ষপাতি। কমিউনিস্টদের সংগঠন ক্ষমতার তিনি প্রতিবাদ করতেন।"(দ্রঃ সকল কাজের সেবা, সতীনাথ স্মরণে সুবল গঙ্গোপাধ্যায় সম্পাদিত) এই সময় জয়প্রকাশ নারায়ণ, গঙ্গাস্মরণ সিংহ, বিহারের অন্যান্য স্যোসালিস্ট কর্মীদের সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয়। প্রকৃত পক্ষে ৪২ এর আন্দোলনের সময় থেকেই তাঁর যুক্তিবাদী মন ভিন্ন রাজনৈতিক মতাদর্শের সংকীর্ণতা, দলাদলি, ক্ষমতা অর্জনের জন্য লোভ, ও আদর্শগত গোঁড়ামি দেখে সংশয়গ্রস্ত হয়ে পড়ে। তবু কোনো রকম কারণ না দেখিয়ে ১৯৪৮ খ্রীঃ কংগ্রেসি পদে ইস্তফা দেন। পরে কংগ্রেস স্যোসালিস্ট পার্টিতে আসেন। কিন্তু সেখানেও এই তীক্ষ্মধী, সত্যপ্রিয় মানুষটি কৃষাণ মজদুর সমস্যা নিয়ে আলোচনা শুরু করায় পার্টির ধনি সদস্যরা আতঙ্কিত ও বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠেন। সতীনাথ পার্টি ত্যাগ করেন, জীবন্ধর্মী সাহিত্য রচনায় মন দেন। অনুগত সহকর্মী ফণীশ্বর নাথ রেণুর স্মৃতিচারণায় জানা যায়ঃ "ভাদুড়ীজীর পার্টি ত্যাগের জন্য জমিদার পুত্ররা আন্দন্দিত হয়েছিলেন" (ভাদুড়ীজী, সতীনাথ স্মরণে পূর্বোক্ত)

সতীনাথের প্রত্যক্ষ রাজনৈতিক অভিজ্ঞতার সঙ্গে যুক্ত হয় ভাষাচর্চা ও নানাবিধ গ্রন্থ পাঠ। মনজগত সমৃদ্ধ হয় বাংলা ছাড়া হিন্দি-উর্দু-সংস্কৃত এবং ইংরেজ-ফরাসি-জার্মান-রাশিয়ান ভাষা শিক্ষায় এবং মনস্তত্ত্ব, সমাজতত্ত্ব, ধর্মতত্ত্ব, বিজ্ঞানসাহিত্য প্রভৃতি বিষয়ের অনুসন্ধানে পড়েন স্পিনোজা লুকাচ, ইসব স্যিমুন দ্য বোভেয়া, অ্যাসলি মন্টেগু, কৃষ্ণদাস কবিরাজ, তুলসী দাস, রবীন্দ্রনাথ বিভূতিভূষণ, শরৎচন্দ্র, সার্থে, কাম্যু, জন ওয়েল, কিং সলি প্রভৃতি। প্রথমদিকে যোগ দেন সাহিত্যিকদের দাদামশায় কেদারনাথ

বদ্যোপাধ্যায়ের সাহিত্য আসরে। লেখেন নবশক্তি, বিচিত্রা প্রভৃতি পত্রিকায় কিছু স্যাটায়ার জাতীয় লেখা। তবে প্রকৃত লেখক রূপে আত্মপ্রকাশ ঘটে জাগরী থেকে। এবার ভাগলপুর সেন্ট্রাল জেলে বসে লেখা হয় এই আশ্চর্য রচনাটি। লেখকের ভাষায় Experiment এর পর লেখা হয় তাঁর অন্যান্য গল্পউপন্যাস। ১৯৫০ খ্রীঃ জার্মানি অস্ট্রিয়া এবং ফরাসি দেশে যান। ফরাসি বিশ্ববিদ্যালয়ে এক বছর নিজের ইচ্ছামতো পড়াশুনা করেন। ফান্সে থাকাকালীন জাগরী রবীন্দ্র পুরস্কার প্রাপ্তির সংবাদ পান। তবে রাশিয়ায় গিয়ে সমাজ জীবন ও অর্থনৈতিক উন্নত্রি দর্শনের আকাঙ্ক্ষা ওই দেশের সরকারের অনুমতির অভাবে অপূর্ণ থেকে যায়। ১৯৫০ খ্রীঃ জুন মাসে ভারতে ফিরে আসেন। তারপর পূর্ণিয়া বিরাট বাড়িতে ফুল ফুটয়ে ঋতুতে ঋতুতে পাখি দের আসা জাওয়া লক্ষ করে আর সাহিত্য চর্চা করে কেটে যায় তাঁর বাকি জীবন। ১৯৫১ থেকে ১৯৬৫ মধ্যে প্রকাশিত হয় অন্যান্য উপন্যাস ও গল্পসংকলন। ১৯৬৫ খ্রীষ্টাব্দের ৩০ মার্চ এই মিতবাক্ সত্যনিষ্ঠ অকৃতদার লেখকের জীবনাবসান হয়।

উপন্যাস – জাগরী (১৯৪৫), ঢোঁড়াই চরিত মানস (প্রথম চরণ ১৯৪৯, দ্বিতীয় চরণ ১৯৫১), চিত্রগুপ্তের ফাইল (১৯৪৯), সত্যি ভ্রমণ কাহিনি (১৯৫১), অচীন রাগিনী (১৯৫৪), সংকট (১৯৫৭), দিক্‌ভ্রান্ত (১৯৬৬)।

১১.৩ গল্পসাহিত্যের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি ও লেখকসত্তা

গল্পসংকলন – গননায়ক (১৯৪৮), অপরিচিতা (১৯৫৪), চকাচকি (১৯৫৬), পত্রলেখার বাবা (১৯৬০), জলভ্রমি (১৯৬২), আলোকদৃষ্টি (১৯৬২), সতীনাথ বিচিত্রা (মৃত্যুর পর প্রকাশিত)।

সতীনাথের রাজনীতি সচেতন জীবন ভাবনার প্রথম প্রকাশ জাগরী। এটি প্রথম রবীন্দ্রপুরস্কার প্রাপ্ত উপন্যাস। UNESCO থেকে লীলা রায় কৃত এর ইংরেজি অনুবাদ – The Vigil (1865) নামে প্রকাশিত হয়। জাগরী শব্দের আভিধানিক অর্থ বিনিদ্র ফাঁসির দণ্ডে অভিযুক্ত । এক রাজবন্দি আসামীর সঙ্গে তাঁর বাবা মা ছোট ভাই নীলুর সারারাত্রের স্মৃতিচারণায় কাহিনি কথন। এক রাষ্ট্রীয় পরিবারের ঘটনা এর মূল

অবলম্বন। উৎস – হাজারিবাগ জেলে থাকার সময় সতীনাথ পুরুলিয়ার ঋষী নিবারণচন্দ্র দাশগুপ্ত ও তাঁর ছেলে বিভূতি দাশগুপ্ত, অতুল ঘোষ ও তাঁর সহধর্মিনীর সঙ্গে পরিচয় মারফৎ শোনেন সত্যাগ্রহী এক পরিবারের ঘটনা। উপন্যাসের কাহিনিতে দেখা যায় – ফাসি সেলে আসামি বিলু, আপার ডিভিসন সেলে বাবা, আওরতকিতায় মা জেল গেটের বাইরে নীলু জীবন বিশ্লেষোণে রত। বিয়াল্লিশের আন্দোলনে উত্তাল পূর্ণিয়া জেলা ও জনজীবনের রাজনৈতিক পটভূমি। কংগ্রেস, কংগ্রেস সোস্যালিস্ট, এবং কমিউনিস্ট এই তিনটি দলের রাজনৈতিক মতাদর্শ যথাক্রমে বাবা, বিলু এবং নীলু মাধ্যমে উপস্থাপিত। কিন্তু কোথায়ও চরিত্রগুলি রাজনৈতিক মতাদর্শের পুতুলে পরিণত হয়নি। লেখকের ব্যক্তিগত পক্ষপাত কখনও অন্যমতকে আচ্ছন্ন করে নি। শ্রেণিগত বিচারে এই উপন্যাস যেমন রাজনৈতিক তেমনি আঞ্চলিকও বটে। সমালোচকের ভাষায় – "রাজনীতির ভিতরের যে রাজনীতি অর্থাৎ ব্যক্তির বা গোষ্ঠীর ক্ষমতাদখলের কূটনীতি যা চিরদিনই রাজনীতির পরিবেশ ক্লীন্ন করে তোলে, যা বিহারের রাজনীতিতে আবহমান কালের দুষ্ট ক্ষত সতীনাথ সেদিকেও থাকেন সতর্ক, তাই দেখা যায় সদাশিউ বনাম বৈজনাথের কদর্য কলুষ মূর্তি দুটি রকমারি আধিদৈবিক আর অজ্ঞানতা নিয়ে পূর্ণিয়ার যে সংস্কারগ্রস্ত লোকজীবন তাঁর আর্ত অস্তিত্ব নিয়ে বিরাজ করে সেদিকেও সতীনাথ পূর্ণ মাত্রায় সচেতন।"(দ্রঃ সতীনাথ ভাদুড়ীর গল্প উপন্যাস, বাংলা কথাসাহিত্যে বিহারের লোকজীবন, বারিদবরণ চক্রবর্তী।

এই উপন্যাসের শিল্পরীতির অনন্য বৈশিষ্ট্য – চেতনাপ্রবাহ রীতির সার্থক প্রয়োগ। সমালোচকের বিচার – বস্তুত চেতনাপ্রবাহরীতির যে সার্থক প্রয়োগ জাগরীতে দেখা গেছে তা বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে বাংলা উপন্যাসে বিরল দর্শন। লেখক অশেষ নৈপুণ্যে একটি অখন্ড রসলোক নির্মাণ করেছেন, অসংখ্য প্রসঙ্গ ও অনুপুঙ্খ বর্ণনার মধ্য দিয়ে চেতনাপ্রবাহকে অবিচ্ছিন্ন প্রবাহে পরিণত করেছেন।

গল্প-সংকলনঃ-

ঔপন্যাসিক সতীনাথ বেশ কিছু সার্থক ছোটগল্পের স্রষ্টা। তাঁর গল্প সংখ্যা ৬২। দেশ, আনন্দবাজার, অমৃতবাজার, যুগান্তর, পরিচয়, বিচিত্রা, চতুরঙ্গ, পূর্বাশা, দৈনিক কৃষক,

স্বাধীনতা, বিশ্বভারতী ইত্যাদি খ্যাতনামা পত্রিকায় তাঁর গল্পগুলি প্রকাশিত হয়। তাঁর গল্পের উৎস বাস্তব অভিজ্ঞতা। বৈশিষ্ট্য – ক) মানবিক দৃষ্টিভঙ্গী, খ) ব্যঙ্গ প্রবণতা, গ) মননশীলতা ঘ) নিরাসক্তি।

তাঁর গল্পের পটভূমি পূর্ণিয়ার মাটি ও মানুষজন। সেই অর্থে হয়তো তিনি কিছুটা আঞ্চলিক। "কিন্তু যেখানে তাঁর সৃষ্টি এই মানসিকতা ছাড়িয়ে নির্বিশেষ হয়ে উঠতে পেরেছে তাঁর সতর্কতা, আত্মসমালোচনা, মার্জিত এবং পর্যবেক্ষণের নিপুণতায়, সেখানে তিনি কালোত্তীর্ণ রচনার স্রষ্টা " (সতীনাথ ভাদুড়ীর নির্বাচিত রচনা, প্রাককথন, বারিদবরণ ঘোষ।) এই পর্যায়ে কয়েকটি গল্পের নাম উল্লেখযোগ্য – গণনায়ক, বন্যা আন্টাবাংলা, চকাচকি, বৈয়াকরণ, চরণদাস এম এ, মুনাফাঠাকরুণ, পত্রলেখার বাবা, ডাকাতের মা ইত্যাদি। অন্যান্য লেখকদের সঙ্গে সতীনাথের স্বাতন্ত্র্য একটি ক্ষেত্রে দেখা যায় এই যে, তিনি কখনই একই গল্পের প্লট নিয়ে বক্তব্যের পুনরুক্তি করেননি। সতীনাথের সাহিত্যচর্চার সূচনা হয় গল্প লিখে, তরুণ বয়সে লেখা প্রথম গল্প জামাইবাবু। (বিচিত্রা, ১৩৩৮ অগ্রহায়ণ), এর বিষয় মূল্য অকিঞ্চিতকর। পরবর্তী গণনায়ক গল্প সংকলন থেকেই যথার্থ আত্মপ্রকাশ, দেশ বিভাগের সমকালে হিন্দু মুসলমান সম্প্রদায়ের সাধারণ মানুষকে ঠকিয়ে কীভাবে পয়সা করেছিল মুনিমজীর মতো ভন্ড দেশভক্তেরা গণনায়ক গল্পে আছে তাঁর পরিচয়। কমিশনের রায় বেরোবার আগেই সে ভারত পাকিস্তানের পতাকা বিক্রি করে, তারপর অঞ্চল অনুযায়ী দেশভাগ হলে দুই সম্প্রদায়ের কাছ থেকে পতাকা ফিরিয়ে নিয়ে আবার অন্যত্র বেচবার ফন্দি করে। 'বন্যা' গল্পে দেখা যায় নৈসর্গিক বিপদ কীভাবে সামাজিক মর্যাদা জাত পাতের ক্ষুদ্র স্বার্থের রেখা মুছে দিয়েছিল। নৌখে ঝা আর সুমৃৎ তিয়রের প্রিবার দুটিকে তথা ব্রাম্ভণ ও তিয়র জাতিকে একত্র করেছিল। কিন্তু কুশী নদীর বন্যার জল শুকিয়ে যাওয়ার পরে আবার সেই পুরানো কলহ জেগে উঠেছে। 'আন্টাবাংলা' গল্পে পুর্ণিয়ার নীলকর বংশধরদের পাশবিক অত্যাচার এবং খ্রিস্টান ওরাংদের দাশজীবনের যন্ত্রণার ঐতিহাসিক চিত্র বর্ণিত। জনপ্রতিনিধিদের চরিত্রহীনতা ও তোষণনীতির তীব্র সমালোচনা 'একচক্ষু গল্প' হরিতকি থানার সিরিটোল গ্রামের পটভূমিতে বিশম্ভর ও

সুচিত মন্ডল চরিত্রদুটির মধ্যে দিয়ে লেখকের ভোটের রাজনীতি সম্পর্কে সতর্ক সগকেত অনুভব করা যায়। তাঁর 'করদাতা সংঘ জিন্দাবাদ' এবং 'পরকীয়া' 'সন ইন ল' গল্পের মধ্যে দলীয় রাজনীতির সরস সমালোচনা উপভোগ্য হয়ে উঠেছে। 'ভূত' গল্পে আছে সূরজ কুমারী বিবাহকে কেন্দ্র করে বিহারের গ্রাম বনাম শহরের কায়স্থ সমাজের দ্বন্দ্বময় চিত্র। এতবে শেষ পর্যন্ত এই গল্পের মূল দ্বন্দ্ব হিন্দু-মুসলমানের পারস্পরিক সম্পর্কের মধ্যে ইঙ্গিতে নির্দেশিত। 'বৈয়াকরণ' গল্পে মৌলবী এবং সংস্কৃত পন্ডীত তুরন্তলাল মিশ্রের পারস্পরিক তুলনার মাধ্যমে ইন্দ্রিয়াশক্তির প্রকাশরূপ বিশ্লেষিত। পার্থক্য কেবল ইন্দ্রিয়াশক্ত মৌলবী সাহেবের ক্ষেত্রে এর বিকাশ স্থূল ভাবে, আর পন্ডিতজীর ক্ষেত্রে মনোবিকার চোরাপথে ব্যক্ত হয়েছে। আবার প্রবাসী বাঙালী পরিচয় দিতে নয়, বৈজ্ঞানিক নৈব্যক্তিকতায় সতীনাথ মধ্যবিত্ত বাঙালী যুদ্ধকালীন স্বার্থান্ধতার নির্মম চিত্র এঁকেছেন। 'পরিচিতা', 'দাম্পত্য সীমান্তে', 'সরমা', প্রভৃতি গল্পে প্রথমটিতে একশো আঠাশ টাকা মাইনের কেরানীর বউ শৈল, দেশভাবগে আগত উদবাস্তুদের দেশে দেখে উৎফুল্ল, কারণ কম টাকায় তাহলে চাঁপা টাপাদের মতো ঝি পাওয়া যাবে। দ্বিতীয় গল্পের নায়ক পোস্টাফিসের কর্মচারী নিবারণ পার্সেল ব্যাগের চোরা কারবারে স্ত্রীর সাক্ষ্যে ধরা পড়ে গিয়ে পুলিশ অফিসারকে বলে 'কি পরিমান বদ দেখছেন তো হজুর মেয়েমানুষটা, নাগরকে বাঁচিয়ে স্বামীকে জেলে পুড়তে চাই' 'সরমা' গল্পে যখন ডোমেরা জাতীয় প্রতিরক্ষা তহবিলে মুক্ত হস্তে দান করে, তখন চরম নির্লিপ্ত কুকুর-বিলাসী হরেন বাবু স্থানীয় অঞ্চলে এয়ার বেস হলে কীভাবে কতপরিমাণে প্যারাসুটের রেশমি দড়ি পাওয়া যাবে ভাবতে থাকেন। কারণো সেই দড়িতে এত ভাল কুকুরের গলার বেল্ট হবে, 'অ্যালসিসিয়ান, গ্রেট ডেন, ম্যাস্টিক, ব্লাড হাউন্ড, কারোও দম নেই সেই দড়ি ছেড়ে।' আসলে সতীনাথের গল্পগুলির মৌলিকত্ব এখানেই, - তাঁর গল্পগুলিতে একটি বিশিষ্ট ভৌগোলিক পটভূমিকা থাকে, স্থানে স্থানে গল্প বিশেষে জনপদজীবনের পরিচায়কও বটে। কিন্তু সেখানেই তা থেমে যায় না, - ক্রমশ ছড়িয়ে পড়ে সার্বজনীন প্রতীতি ভূমিতে। গল্প শুরুর প্রথমে সযত্নে রচিত হতে থাকে যে ভৌগোলিক পরিমন্ডলটি, সমাপ্তিতে সেটি অনিবার্য ভাবে ভেঙ্গে যায় – আত্মপ্রকাশ করে মনস্তাত্ত্বিক ও ঘটনাগত ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়া নিয়ে চিরদিনের মানবসত্তা।

সতীনাথের গল্পগুলির উৎসভূমি তাঁর বাস্তব অভিজ্ঞতা। ‘গণনায়ক’ –এর গ্রন্থ সূচনায় লেখক মন্তব্য করেছিলেন – ‘লেখাগুলি বিবরণোমূলক। বিবরণের যথাতথ্য সামান্য পরিমাণে ক্ষুন্ন করিতে বাধ্য হইয়াছি, - পাছে প্রাণহীন প্রতিলিপি হইয়া দাঁড়ায়, সেই ভয়ে এবং আরও কয়েকটি কারণে।’ এই প্রাণহীন প্রতিলিপিগুলি বেশির ভাগ ক্ষেত্র সতীনাথের ডায়েরিসমূহে প্রথম স্থান পেতো, পরে প্রাণ প্রতিষ্ঠার পর, সাময়িকপত্রের পৃষ্ঠায়। সতীনাথের গল্পসমূহের পটভূমি তাঁর চেনা পরিবেশ – পূর্ণিয়ার মানুষ, পূর্ণিয়ার মাটি। সে কারণে তাঁর সাহিত্যচর্চাকে কেউ কেউ বলেছেন আঞ্চলিক। বস্তুতপক্ষে তাঁর প্রতিটি গল্পে জীবনের যে অভিজ্ঞতা ব্যক্ত, তার আধার হয়েছিল তাঁর এই আঞ্চলিক মানসিকতা। কিন্তু যেখানে তাঁর সৃষ্টি এই মানসিকতা ছাড়িয়ে নির্বিশেষ হয়ে ঊঠতে পেরেছে তাঁর সতর্কতা, আত্মসমালোচনা, মার্জিত এবং পর্যবেক্ষণের নিপুণতায়, সেখানে তিনি কালোর্ত্তীণ রচনার স্রষ্টা। সতীনাথ তা বলে শরৎচন্দ্র নন, তারাশঙ্কর, বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, মানিক বন্দ্যোপাধায় এমন কি সরোজকুমার রায় চৌধুরীও নন। এর প্রধানতম লক্ষণ হয় সতীনাথ কখনো এক গল্প দুবার লেখেন নি।

সতীনাথের গল্পের আরেক লখনীয় গুণ এর ব্যঙ্গপ্রবণ চরিত্র – যদিও তা সর্বাঙ্গে জড়িত নয়। এই রহস্যপ্রবণতা যেমন আপাত অসংগতি – যার সঙ্গে তাঁর আপোষ – মীমাংসার প্রশ্ন ছিল না – তা থেকে জাত, তেমনি সম্ভবতঃ কেদারনাথ বন্দ্যোপাধায়ের সাহচর্যের কারণেও।

সতীনাথের একটি গল্পের নাম ‘অপরিচিত’। এটি সতীনাথের একমাত্র প্রেমের গল্প সম্ভবতঃ। এ থেকে বোঝা যায় ‘প্রেম’ সতীনাথের গল্প উপকরণ জোগাতে সমর্থ হয়নি। সতীনাথের মনের কাঠামো ছিল না এর অনুকূল। তবে সতীনাথের গল্প কি আছে আর? সতীনাথের গল্প প্রবল হিউম্যানিস্ট। এরই প্রতি পরতে প্রবেশ করতে গিয়েই সতীনাথ বদলে গেছেন অনবরত। অথচ পরিবর্তনে পরীক্ষার ছাপ নেই। ফরাসী সাহিত্যে পড়েছেন – গল্পের আঙ্গিকে তাকে করেছেন স্বীকারও, অথচ তার শরীরসর্বস্বকে বর্জন করলেন – এ অল্প সামর্থ্যের পরিচয় নয়! আসলে স্বাধীনোত্তর দেশের বিশৃঙ্খলা, আমলাতন্ত্র এবং নানা অব্যবস্থা তাঁর মনকে করে তুলেছিল চিন্তাখিন্ন। অথচ আশ্চর্য

স্থৈর্থের সঙ্গে সেই অব্যবস্থাকে মোকাবিলায় গেছেন এগিয়ে। সেজন্যই তাঁর ছোটগল্পের অঙ্গীরস হয়ে উঠেছে সুস্নিগ্ধতা। এটাই সর্বব্যাপী শিল্পের একটা আবশ্যিক ধর্ম।

এই সংকলনে ধৃত সমস্ত গল্পগুলির টীকারচনা আমাদের উদ্দেশ্যের অন্তর্ভুক্ত নয়, তা হওয়া উচিতও নয়। বিশাল পাঠকমন্ডলী তাকে বিচার করবেন তাদের রুচির বিভিন্নতার, দৃষ্টিভঙ্গির বিচিত্রতায়। কেউ তুষ্ট হবেন গল্পে নিরাসক্তি লক্ষ্য করে, কেউ বা খুশি হবেন তাঁর হাস্যরসের স্নিগ্ধতায়, কেউ বা শূচিস্মাত বোধ করবেন এর মননশীলতায়। এমন ক'টি লক্ষণ তাঁর বিখায় কয়েকটি গল্পে ওতপ্রোত হয়ে আছে।

'গণনায়ক' গল্পটি তাঁর উক্ত নামধেয় গল্পগ্রন্থের প্রথম গল্প – যদিও তাঁর লেখা প্রথম গল্প নয় (তাঁর লেখা প্রথম গল্পটি শ্রেষ্ঠ হয়তো নয়, তবে প্রথম গল্পের মর্যাদার কারণে জামাবাবু, এই সংকলনে স্থান পেয়েছে)। দেশ বিভাগের সমসাময়িককালে গণনায়ক রচিত হয়েছিল বলে আবশ্যিকভাবে তখনকার অনুভূতি এই গল্পে উচ্চারিত। দেশবিভাগের 'মওকা' লুটেছিল যে হিন্দু মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের তথাকথিত দেশপ্রেমিকেরা তাদের যথার্থ স্বরূপটি এই গল্পে ধরা আছে। গান্ধীটুপে এই ব্যবসায়ের প্রথম মূলধন। নির্লজ্জতারও তো একটা সীমা থাকে।

এই একই অত্যাচার-অবিচার এবং অন্যায়ের পাহাড়কে বন্যা ভাসিয়ে নিয়ে জেতে পেরেছে কিনা জানিনা, কিন্তু তার স্রোতে রিলফ ক্যাম্পের যথাযথ ক্রিয়াবারিধি মূর্ত হয়ে উঠেছে। এটা গল্পের আপাত একটা দিক। মনুষ্যচরিত্রের সেই চিরন্তন দিকটা – অসহায় মুহূর্তে ঐক্যবোধে জেগে উঠে পুনশ্চ সংকটান্তে বিভেদের স্বরূপে আত্মপ্রকাশ – এই গল্পে পারগ্রহ করেছে চিরন্তনী বাণীরূপ।

কিন্তু 'আন্টা বাংলা' তুলনাহীন। বরেন বসুর 'রিক্রুট' যেমন 'রঙরুটে' পরিণত হয়েছিল, তেমনি প্ল্যান্টার্স ক্লাব হয়েছে এখানে লোকমুখে আন্টা বাংলা। পূর্ণিয়ার নীলকরদের সেই ব্যভিচার ও ঐশ্বর্য বুঝি নীলদর্পণকেও হার মানায়। বাঙ্গালীর নো-এন্ট্রী ক্লাবে আস্তে পেতো বিরসা ওঁরাওদের মতো খ্রীষ্টান বেয়ারারা, তবু বিরসার নাতি বোটোরা ছাড়তে চায় না সেই ক্লাব অসীম মোহে। শেষে এক দুঃস্থ অবস্থার মধ্যে তাকেও মৃত্যুবরণে হতে হল প্রস্তুত। তবুও তার মোহাচ্ছন্ন চোখে জেগে ওঠে আন্টাবাংলার

মহিমা। উপন্যাসের এক বিস্তৃত মহত্ত্বতায় পরিস্থাপিত এই গল্পে দাসেদের দাসজীবন প্রার্থনায় পটভূমিকায় প্রভুত্ববাদী শোষণবাদিতার একটা উলঙ্গরূপ উদঘাটিত হয়ে সর্বকালীন শ্রেষ্ঠ গল্পে পরিণত করেছে এর কাহিনিকে।

চকাচকী গল্পে এক প্রত্যাশিত অপ্রত্যাশিতের মিলন ঘটেছে নিতান্ত অপ্রত্যাশিতভাবে। 'জাগরী'র হরদাহার্টের দুবে-দুবেনী 'চকাচকী' গল্পে এসে প্রেমের ভিড় জমিয়েছে। বাস্তব এই চরিত্র দুটি যে বিবাহিত নয় সামাজিকভাবে তা কে জানতো। সবাই যখন ভাবছে দুবে দুবেনীর প্রেম বিচ্ছিন্ন হবার নয়, তখন হঠাৎ দেখা গেল মৃত্যুশয্যায় শায়িত দুবেকে ফেলে দুবেনী গেছে পালিয়ে। দেশ থেকে দুবের ছেলে এসে অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন করল। কিন্তু হঠাৎ কেন আমরা দেখলাম সৎকারক্রিয়া যখন সম্পন্ন প্রায়, তখন শ্মশানের ওপারের কাশবন নড়ে উঠেছে। 'না কিছু নয়, শেয়াল বোধহয়।'

পুরুষের প্রবৃত্তির বিশ্লেষণ নিয়ে নির্মিত হয়েছে 'বৈয়াকরণ' গল্পের দেহ। শুদ্ধাচারী পন্ডিতের চোখে রূপহীনা ছাত্রীর দোষ প্রতিপদে, অথচ রূপসী ছাত্রী পায় দোষেও মুক্তি। ইন্দ্রিয়াসক্তির এই বৈষম্য এক সময়ে পন্ডিতের মনে জাগায় আত্মবিচরণীয় প্রশ্ন। স্থূল প্রবৃত্তির স্থূলতাকে অতিক্রম করে গেছে শেষ অবধি এই গল্পের সূক্ষ্মতা।

এমনি চরণ দাস এম এল এ মুনাফা ঠাকরুণ, পত্রলেখার বাবা, ডাকাতের মা প্রভৃতি গল্পে নির্মম সত্য, পরিহাসের কাঠিন্য এমন নিপুণভাবে উচ্চারিত যে সতীনাথ যে কি চান তা বুঝতে পারি না। এজন্যেই কি তিনি 'দিগ্‌ভ্রান্ত' উপন্যাসের কপালটুকিতে ঐ শ্লোক দুটি উচ্চারণ করেছিলেন – 'কালির লেখন সবাই পড়ে, কালের লেখন গুমরে মরে।'

সতিনাথ যতই বলুন কালের তাঁর গল্পে অন্ততঃ গুমরে মরে না। একথা বুঝতে পেরেছেন বলেই সতীনাথের জীবিতকালের শ্রেষ্ঠ প্রকাশক বেঙ্গল পাবলিশার্স সতীনাথের 'কালির লিখন'কে এমন সম্ভারেসজ্জিত করায় হয়েছেন সানন্দপ্রয়াসী। আমার মতো অকৃতজনকে এই দায়িত্বদানের মধ্যে তাঁর ব্যবসায়িক মনের সবুজভাবে যে হরিদ্রাভ হয়নি এখনো। তা স্পষ্ট ধরা পড়েছে। ময়ূখবাবুর বাবা আমাকে অশেষ স্নেহে সিক্ত রেখেছেন দীর্ঘকাল – তিনি তারই পুত্রকৃত্য করলেন কিনা জানিনা। এই

নির্বাচনে স্বভাবতই বিভিন্ন গল্পসংকলন, সতীনাথ গ্রন্থাবলীর সম্পাদকযুগল, শ্রীগোপাল হালদারের চমৎকার বইখানি, শ্রীসুবল গঙ্গোপাধ্যায় 'সতীনাথ স্মরণে' এবং অন্যান্য নানা টুকরো রচনার সাহায্য পেয়েছি। এ সব স্বীকারের আনন্দ তখনই কূল ছাপিয়ে উঠবে, যখন বাঙালী পাঠক এই শ্রেষ্ঠ গল্পকে বরণ করে নেবেন তাদের সহজ আনন্দে।

"গণনায়ক" ছোটগল্পে সাম্প্রদায়িক অশান্তি, ধর্ম সম্পর্কিত গোলযোগের পরিস্থিতি কীভাবে দাবানলের মতো চড়িয়ে পড়তে পারে, ও মানুষের স্বাভাবিক জীবনকে বিপন্ন করে তুলতে পারে তারই ছবি এখানে উঠে এসেছে। এই গল্প সেই সময় লেখা যখন অবিভক্ত ভারত ভেঙ্গে দুই পৃথক রাষ্ট্রের জন্ম হচ্ছিল, তাই কোন প্রদেশ মুসলিমদের পাকিস্তানে আর কোন প্রদেশ ভারতের অন্তর্ভুক্ত থাকবে সেই নিয়েই কথাবার্তা চলতে থাকে, কিন্তু এই প্রাথমিক কথাবার্তায় ক্রমে উত্তেজনাময় বাতাবরণের জন্ম দেয়।

গল্পকার বর্ণনা দিয়েছেন –

"পরের দিন থেকেই আরুয়াখোয়ার রূপ যায় বদলে। আগে সপ্তাহে একদিন হাট বসতো – এখন অহোরাত্র ভয়ার্ত নরনারীর নিরানন্দ মেলা। গাড়ীর পর গাড়ী আসছে পুল পার হয়ে শ্রীপুরের দিক থেকে। হেঁটে চলে আসছে দলে দলে মেয়ে, ছেলে, গরু, ছাগল। ছোট ছেলেটির মাথায় পর্যন্ত হাঁড়িকুড়ির বোঝা চাপানো। ধুঁকতে ধুঁকতে হাড়-জিলজিলে কালাজুরের রুগী, একটা বিড়াল কোলে নিয়ে। কাশতে কাশতে চলেছে হেপো বুড়ী – পাকিস্তান থেকে বাঁচতে গিয়ে প্রাণটা বেরোয় বুঝি! এতদিন ছোট্টো ছিল এদের জগৎ। আজ হাটে বিশ্রাম করে কতক যাবে এগিয়ে, শিকারের খেদানো হরিণের মত, অনির্দিষ্ট লক্ষ্য নিয়ে। কতক যাবে থেকে; যদি ক্ষেতের কাজ পায়, এই আশায়। পথে খাওয়ার অভাব কি – এখন তাল পাকার সময়।"

"পূর্ণিয়া আর দিনাজপুর দুটো ডিস্ট্রীক্ট বোর্ডের মধ্যে কোনটাই নাগরে'র উপরে পুলের জন্য খরচের দায়িত্ব স্বীকার করে না। নড়বড়ে পুলটার উপর খুব ধকল চলছে আজ ক'দিন থেকে..."

কমিশনের রায় নিয়ে মুসলিমদের মধ্যে নিয়ত এক আতঙ্ক দানা বাঁধতে থাকে। ‘দিনাজপুর আর মালদার শরণার্থীদের ভীতিবিহ্বল মুখে উৎকণ্ঠার ছায়া ঘনিয়ে আসে। এক সঙ্গে সকলেই প্রশ্ন করে – ‘কমিশন’ ‘আর কমিশনের রায়?’ এদিকে রিলিফ ক্যাম্প শুরু হওয়ায় সেখানে সমস্ত জিনিসের দাম প্রচুর ভাবে বাড়তে থাকে। দুদিনের মধ্যে সব ঝান্ডা চড়া দামে বিক্রি হয়।

‘নিরবচ্ছিন্ন উতসাহ ও উদ্দীপনার মধ্যে পনেরই আগস্ট স্বাধীনতা দিবস উদযাপিত হয়। পুলের এপারে হিন্দুস্থানের পতাকা, ওপারে পাকিস্তানের ঝান্ডা।’ কিন্তু আরুয়াখোয়ার এমন ছবি সত্যিই ভাবতে পারে না দর্পণ সিং। সে ভাবে – ‘সে ও থাকে আরুয়াখয়ায়, মন পড়ে থাকে শ্রীপুরের জমির উপর। এই পুলটিই তাঁর দেহ ও মনের সংযোগের সূত্র। এরই জন্য সময়মতো এদিকে পালিয়ে আসা সম্ভব হয়েছে; ভগবান যদি সুদিন দেন তাহলে এই দিয়েই আবার নিজের দেশে ফিরে যেতে পারবে। না ভগবান কেন, কমিশন। কমিশন কি ভগবানের চাইতেও বড়? -’

দুদিকের লোকের সম্মতি নিয়ে রিলিফের বাবুরা পুলের মধ্যেখানে ঝান্ডাভূতের খেলা দেখায়।

‘বন্য’

গল্পের আরম্ভ হয়েছে অকস্মাৎ বন্যার খবর দিয়ে গল্প আরম্ভ হয়েছে। লেখক তার বর্ণনা আরম্ভ করেছেন এই ভাবে- “কুশীতে বান আসিয়াছে; একরকম নোটিস না দিয়াই। নেপালে কোন্ পরবত শিখরের বরফ গলিয়াছে, হিমালয়ের কোন্ অরণ্যময় উপত্যকায় বারিপাত হইয়াছে, তাহার খবর কুশীর তীরের লোকরা রাখে না। তাহারা খুঁজিতে আরম্ভ করে, কোন পাপে ভগবান তাহাদের ওই শাস্তি দিতেছেন।”

রহিকপুরা গ্রামের বর্ণনা দেওয়া, মেয়েদের কতর্ব্য কর্ম, পুরুষদের কাজের অভ্যাস থেকে আরম্ভ করে বিপদকালীন পরিস্থিতির অভাব অনটনের দৃশ্যাবলী ঘটনাপরম্পরায় লেখক তুলে এনেছেন। ‘কেরোসিন তেলের অভাব’ খুব পরিষ্কার ভাবে বোঝা যায় আপদকালীন পরিসরে দারিদ্র্যতা কেমন করে গ্রামের মানুষের সাংসারিক মেরুদন্ডকে

ভেঙ্গে চুরে দিয়েছে। গ্রামের মাতব্বর মোহান্তজী এরই মধ্যে বাইরে এসে পূর্বাকাশের দিকে তাকিয়ে জয়ধবনি করেন। গ্রামের সকলের সেই আস্থা আর বিশ্বাসের উপর ভর করেই এক সুরে বলতে থাকে মোহান্তজীর কথা। ইতিমধ্যে বন্যার তান্ডব শুরু হয়ে যায়। মুসহরটোলা গ্রামের অর্ধেকের বেশি অংশ জলের গভীরে ডুবে যায়। এই আকস্মিক ঘটনার সূত্র ধরের লেখক তুলে ধরেন নৌখে ঝা আর সুমৃৎ তিয়রের পরিবারের মধ্যে রেষারেষি, ঝগড়া, ফৌজদারি প্রভৃতি গোলযোগের বাতাবরণ। ব্রাম্ভণ ও তিয়র দুইজাতির মধ্যে কলহ। দুই পরিবারের লোকেরা একটি ঘতনা নিয়ে এখন কথাবার্তা বলে না। নৌখে ঝা পুরুবতোলায় লোকেদের তদারকি করতে গেছেন। তাদের পরিস্থিতি দেখছেন। ধাঙর, মুসহর, বাঁতার, তাৎমারা সকলেই আলাদা চৌকি করে ফেলে, তারপর সকল মিলে চড়াইভাতির মনোভাবে কুশীর বান দেখতে থাকে।

কিছুপরে গান্ধি টুপি পড়ে রিলিফ পার্টির লোক আসে। চাল, ভুট্টা, কেরসিন তেল, সরষের তেল, নুন, দেশলাই পাঁকুই – এর ওষুধ সবই আছে। হাজারমনী নৌকা করে সকলকে নিয়ে আসা হল গঞ্জের বাজারে। সেখানে রিলিফ ক্যাম্প হয়েছে। সেখানে ফুলকাহার, মুসহরনীর অন্যান্য ভিন্ গাঁয়ের লোকেদের সাথে দেখা হয়। এমনকি শীর্ষাবাদিয়া মুসলমানরা এখানে এসে আশ্রয় নেয়, সেখানে দেখা যায় ভেদ ভাব দ্বন্দ্ব কোন্দল ভুলে একসাথে রান্নার আয়োজন করে। সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির বাতাবরণ তৈরি হয়। তবে এতকিছুর পরেও সৌখী ঝা আর সুমৃত তিয়র এর পরিবারের মধ্যবর্তী ব্যবধান কিছুতেই মেটে না। শেষের ঘটনায় তার প্রমান – "নৌকা ছাড়িয়া দেয়। পাৎরঙ্গী আবার কখন তাহার ছাগলটিকে চড়াইয়া দিয়াছে নৌকার উপর। সুমৃৎ তিয়র ছুড়িয়া ছাগলটিকে নদীর তীরের দিকে ফেলে, আর সেটিকে উদ্দেশ্য করিয়া বলে, 'তোর জাতভাইদের এখানে ছেড়ে গেলাম। তাদের সঙ্গে আসিস।"

১১.৪ অনুশীলনী

১) সতীনাথ ভাদুড়ী সংক্ষিপ্ত সাহিত্যিক পরিচিতি আলোচনা কর।

২) ছোটগল্পকার হিসাবে তাঁর প্রাসঙ্গিকতা বিচার কর।

মন্তব্য

৩) সতীনাথ ভাদুড়ীর গল্প সাহিত্যের পরিসর আলোচনা কর।

১১.৫ গ্রন্থপঞ্জি

১) চৌধুরী, শ্রীভূদেব, - বাংলা সাহিত্যের ছোটগল্প ও গল্পকার, মর্ডাণ বুক এজেন্সি প্রাঃ লিঃ।

২) দত্ত, বীরেন্দ্র – বাংলা ছোটগল্প প্রসঙ্গ ও প্রকরণ(প্রথম খন্ড), পুস্তক বিপণি।

৩) বাংলা সাহিত্য পরিচয়, ড পার্থ চট্টোপাধ্যায়, তুলসী প্রকাশনী।

৪) সতীনাথ ভাদুড়ীর নির্বাচিত রচনা, বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড।

এককঃ–১২ সতীনাথ ভাদুড়ীর গল্পের সংক্ষিপ্ত পরিচয় – চকাচকি, চরণদাস এম এল এ

বিন্যাসক্রম

১২.১ চকাচকি' গল্প আলোচনা

১২.২ চরণদাস এম এল এ গল্পের আলোচনা

১২.৩ অনুশীলনী

১২.৪ গ্রন্থপঞ্জি

১২.১ 'চকাচকি' গল্প আলোচনা

চকাচকি গল্পটি একটি প্রেমের গল্প, নিছক মানব-মানবীর সাংসারিক প্রেমই কিন্তু সে প্রেম কতর্ব্য কর্ম, দায়িত্বশীলতা, আর আকুতিতে ছিল ভরপুর, সমাজের অপমান বৈষম্য যাকে স্পর্শ পর্যন্ত করতে পারে নি। গল্পের চকাচকি হল ধামদাহা হাটের দুবে দুবেনী। এ গ্রামে বছর চল্লিশের আগে একটা লোটা আর দুবেনীকে সম্বল করে এসেছিল দুবেজী। রোজগারের ধান্দায়। কথক ছিল রাজনৈতিক কর্মী। তাকে বাড়িতে ডেকে খুব খাতির যত্ন করত দুবেনি। প্রশ্ন করেছিল – 'নিজেরা না খেয়ে আমাদের খাওয়াতে দেখে একদিন আমি জিজ্ঞাসা করেছিলাম, কেন তারা এত কষ্ট স্বীকার করে আমাদের জন্যে?

জবাব দিয়েছিল – আপনাদের সেবা করলে রামজী খুশি হবেন। তাঁকে খুশী করতে না পারলে আমাদের পাপ খন্ডন হবে কী করে?'

এমন সরল দম্পতিও কি না পাপের ভয়ে আকুল। রাজনীতি নিয়ে তারা মাথা না খামিয়ে কর্মীদের জন্য যথাসর্বস্ব খরচা করে ফেলে। শুনে ভারি আশ্চর্য লেগেছিল সেদিন কথকের। তারপর তারা অবাক করে দিয়ে বলেছিল, তারা জেলে যেতে চাই।

তখন একটা রাজনৈতিক আন্দোলনে জেলে জাবার হিড়িক উঠেছে তখন। তারপর পুলিশ যখন দুবেনীকে ধরে নিয়ে গেল আর দুবেজীকে সত্তরের বুড়ো বলে ছেড়ে দিল, তখন দারোগা সাহেবের কাছে দুবেজী মাথা কুটতে থাকে।

দুবেজীর বয়সের দরুণ রোজগার কমে গিয়েছে। এতকাল বেতো টাট্টা ঘোড়াটার পিঠে চড়ে কাছাকাছি গ্রামের চাষাদের কাছ থেকে ভ্যারেন্ডার বিচি, ছোলা, তামাক, সরষে কিনে এনে হাটের গোলাদারের কাছ থেকে বিক্রি করা, এই ছিল তাঁর এতকাল পেশা। এখন সে বাড়ি থেকে বের হওয়া বন্ধ করএ দেয়। গোলাদার বলে – 'তবে খাবে কি?' সে নিরুত্তর থাকে। মুশকিল হলো দুবেনীর। গ্রাম থেকে ছুটে ছুটে আসে, কথক নানা প্রকাস্রে জোগাড় করে তাদের দান করে। কিন্তু এইভাবে কি চলে, কানা মুসাফিরলাল একদিন বলেই ফেলল- 'এখানে কি টাকার গাছ আছে? আমরা নিজেরাই চেয়েচিন্তে কোনো রকমে কাজ চালাই – তোমাদের দেশ কোন্ জেলায়? কখন বলো বালিয়া, কখন বলো সারন, কখনও বলো ভোজপুর! কিছু বুঝেও তো পাই না। নিজেদের দেশে চিঠি লেখ না কেন টাকার জন্য? তিনকালে কেউ নেই, এমন লোক হয় নাকি পৃথিবীতে?'

এদিকে দুবেনী শুনেও শোনে না মুসাফিরলালের কথা। বলে, 'আপনাদের দুবেজী কেমন যেন হয়ে গিয়েছে।'

তারপর মাসখানেক দেখা নেই দুবেনী, হঠাৎ একদিন সে এসে হাজির হয়, বলে দুবেজী খুব অসুস্থ। ঘোড়ার পিঠে থেকে পড়ে মাথায় ছোট লেগে অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিল। তারপর পুরানদাহার লোক পৌঁছে দিয়েছে।

এরপর কথক দুবেনীর দুঃখের কথা শুনে রাজনৈতিক কর্মীদের ফান্ড থেকে দুশো টাকা দিলেন। সে নিয়ে দলের অন্যান্য কর্মীদের কাছ থেকে নানা কথা শুনতে হল। তারপর দুবেজীর বাড়ি গিয়ে দেখেন এক গোরু। দুবেজী হাত দিয়ে আছেন। পরে জানা গেল দুশো টাকা দিয়ে গোরু কিনে তারা গোদান করছেন। মরবার আগে তাদের ইচ্ছা ছিল যে গোদানে পাপক্ষালন হয়। পাপমোচনের চেষ্টা এক বাতিকের মতো দাঁড়িয়ে গেল।

কথক ভাবেন – ‘ টাকা দিলাম ওষুধ পথ্যের জন্য, খরচ করে দিলে গোদানে! আমারই ভুল। নগদ টাকা না দিয়ে ওষুধ পথ্য কিনে দেওয়া উচিত ছিল।’

সেই রাত্রে দুবেনী কথককে চল্লিশ বছর পুরোনো এক কথা বলল, ‘দুবেজীর বউ ছিল, ছেলে ছিল, সংসার ছিল। মরবার আগে নিজের ছেলের হাতে জল পর্যন্ত পাবে না, মুখে আগুন পর্যন্ত পাবে না। ওর ছেলে কে নিয়ে এস বাড়ি থেকে – সাহাবাদ জেলা – সাসারাম থানা – হরকতমাহী গামের পচ্ছিমটোলা।’

কথক যখন দুবেজীর ছেলেকে নিয়ে ফিরেছে তখন দেখে দুবেনী নেই। কথক বলেছে–

‘মুসাফিরলাল এখনও বোধহয় ভাবছে যে, সে পালিয়েছে রুগীর সেবা করতে করতে বিরক্ত হয়ে! – কিন্তু আমি তো জানি! – দুবেকে মৃত্যুশয্যায় ফেলে চলে যাবার সময় তাঁর বুক ফেটে গিয়েছে! তবু নিজেকে নিশ্চিহ্ন করে মুছে ফেলে দিয়ে, সে দুবের একার পাপমোচনের ব্যবস্থা করে গিয়েছে! -’

কিন্তু শেষ পর্যন্ত এই মুসাফিরলালও বুঝেছে শেষ চকাচকির প্রেম। কাশবনের ফাঁকেও যে দুবেজীর চলে যাওয়া লুকিয়ে দেখতে থাকে, সেই চাওনি আজ পরম বিরোধী মুসাফিরেও ভাল লাগে।

১২.২ চরণদাস এম এল এ গল্পের আলোচনা

গল্পে রাজনৈতিক কর্মকান্ডের আচরণ সম্পর্কে গল্পকার ব্যঙ্গ করেছেন। রাজনীতি জনসংযোগের মাধ্যম সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই, কিন্তু সেই জনসংযোগ শেষপর্যন্ত পদলালনার কর্মে পর্যুদস্ত হএ এমনটা হয়তো গল্পের মূল চরিত্র চরণদাসও ভাবেন নি। চরণ দাস নাম রেখেছিল তাঁর বাপ মা। লোকে ভালোবেসে তাঁর নাম রাখে শ্রীচরণ দাস এম-এল-এ। সাধারণ লোকের মধ্যে যারা নিজেদের ইংরাজি জানা ভাবে তারা আজকাল ডাকে ইয়েমেয়েলিয়ে সাহাব। বাকিরা মায়লে জী। লখনলাল জী তদবির করে তাঁকে এনেছেন ভোটের ঠিক আগে। জনগণ হল নরনারায়ণ।

লেখক তার এখনকার মেজাজ সম্বন্ধে বলেন – ‘চরণ দাস ঠিক করে রেখেছেন যে কারও কথায় বিরক্তি প্রকাশ করবেন না। এদের বলার উদ্দেশ্য যে তিনি এখানে কখনও এসে ওঠেননি গত কয়েক বছরের মধ্যে। দুবার মন্ত্রীদের সঙ্গে এসেছিলেন দুদিনের জন্য; তখন উঠেছিলেন সার্কিট হাউসে-এ। সেই খোঁটাই বোধহয় এরা দিচ্ছে এখন।’

ফোড়ন দেয় লখনলালজী – ‘সে তো আগেই আরম্ভ হয়ে গিয়েছে। বোলো একবার ভোটার চরণ দাসজী কী জয়।’

বার হলেন খালি গায়ে খালি পায়ে পথের ধূলো বালি ঘাটতে, ঘাটতে। বারো বছরের অনভ্যাসে, পথের ধূলো কাঁকরের ওপর খালি পায়ে হাঁটতে অসুবিধা হচ্ছে। কাঁটার ভয়ে, ভাঙ্গা কাঁচের টুকরোর ভয়ে, একটু সাবধান হয়ে পা টিপে টিপে হাঁটছেন। আগেকার জীবনের খালি পায়ে চলাফেরার সেই সাবলীলতা আর ফিরে আসবার নয়। নিজের অজ্ঞাতে কখন থেকে যেন নাকে কাপড় দিয়ে চলছিলেন, লোটা হাতে একজনকে আসতে দেখে হাতটা নামিয়ে নিলেন। সবাই মুখে মুখে একটি কথা বলতে থাকে। জয় গুরু। চিন্তান্বিত দেখায় এম এল এ সাহেবকে। আরও কয়েকজনের সঙ্গে দেখা হল, সকলেরই হাবভাব এই একই ধরনের। সকলেই ব্যস্ত। কেউ তাঁকে বিশেষ আমল দিচ্ছে না। নিজের সুখদুঃখের কথা, দেশের অবস্থার কথা, পৃথিবীর রাজনীতির কথা, রকেট, অ্যাটম বোমা, আবহাওয়া, ফসলের কথা প্রত্যাশিত বিষয়গুলোর উপর কোন কথা কেউ তোলেনি। কারো কিছু চাইবার নেই। তবে কি এরা চিঠি দিয়ে ফল পাই নি বলে সেই অর্থে গুরুত্ব দিচ্ছে না। এই রকম নানাপ্রকার কথাবার্তা ভাবতে থাকে। নিজের জন্মভূমি সম্পর্কে আশানুরূপ ফল না পাওয়ায় মন ভারাক্রান্ত হয়ে যায়, নিজের দুশ্চিন্তার কথা মুখ ফুটে বলতে পারে না কর্মীদের কাছে। কথাবার্তা আলাপ আলোচনা হতেই সহকর্মীদের কাছ থেকে জানতে পারলেন জগদ্‌গুরু শ্রীসহস্রানন্দ স্বামী বছর তিনেক থেকে এখানে আশ্রম খুলে বসেছেন। তিনি সিদ্ধ পুরুষ এবং এখানকার আবালবৃদ্ধ বনিতা সকলেই তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেছে। এই জন্যই সকলে উঠতে বসতে জয় গুরু বলে। এই জন্যই রাজনৈতিক নেতারা এখানে এসে ফুলের

মালা পান না। আশ্রমে দুপুরে ধর্মগ্রন্থ পাঠ হয় আর সন্ধ্যেবেলায় কীর্তন। স্বামীজী সাধন ভজন নিয়ে থাকেন। ফলমূল ছাড়া কিছু খান না, টাকা পয়সা ছুঁয়েও দেখেন না।তার নামে সবাই পাগল, তাঁর জন্য প্রাণ পর্যন্ত দিতে পারেন। তাঁর বাকসিদ্ধির খ্যাতি অন্য জেলাতেও আছে।

এই সবই আলোচনা করছেন, এমন সময় এক মৌলবী সাহেব এসে হাজির। অফিসে চাকরি করেন, তিনি লোকগণোনার কাজে এসেছেন। অফিসের লোকজনের সঙ্গে কথা বলে কতকগুলি ফর্মে বিবরণ ভরলেন, তারপর এল এম এ সাহেব অতি নম্র ভাবে জিজ্ঞেস করলেন – 'হুজুরের নামও কি এখান থেকেই লেখা হবে?'

মৌলবী সাহেব অতি বিনম্রভাবেই তাঁকে একের পর প্রশ্ন করতে থাকেন, কিন্তু প্রতিটি কথাতেই এল এল এ সাহেব ভয়ানক রেগে যান, আর হুমকি দিতে থাকেন।

এরপরের কথা চরণদাস তারই সহকর্মীরা পরামর্শ দেয়, স্লোগান পাল্টাতে হবে, এখানে জয়গুরুই ভরসা, স্বামী সহস্রানন্দকে নিয়ে এগোতে হবে। ভোটার চরণদাসকে এগোতে হবে গুরু চরণোদাস। তারপর বিকেলের দিকে সাহেব আর বচকন মহতো ফলমূল পেঁড়া, সন্দেশের ভেট নিয়ে খালি গায়ে খালি পায়ে গিয়ে হাজির জগদ্‌গুরু শ্রীসহস্রানন্দের আশ্রমে। তারপর তারই এক ভক্তের কাছে একটি সংবাদ পান, ভুল বশত নাকি সহস্রানন্দ জীর নাম ভোটার তালিকায় ঢুকে গেছে, সহস্রানন্দকে যেহেতু হাতে রাখতে হবে, আতি একদা ঝগড়া করা মৌলবী সাহেবের কাছে তাঁর পায়ে পড়ে অনুমতি আদায়ের জন্য স্বয়ং চলে যান চরণোদাস এম এল এ সাহেব। যিনি কিনা একদা মৌলবীর চাকরি কেয়ে নেয়ার হুমকি পর্যন্ত দিয়েছিলেন, তিনিই আজ মৌলবী সাহেবের পায়ে ধরে ক্ষমা চেয়ে এই অনুরোধ জানান সহস্রানন্দজীর নাম তালিকা পঞ্জি থেকে বাদ দিতে হবে কেননা তিনি তো মানুষ নন, ভগবান। অর্থাৎ ভোটের জন্য একজন শিক্ষিত শহুরে নাগরিক কিরকম ভাবে মিথ্যাচার করতে পারে এই হচ্ছে তাঁর নমুনা।

১২.৩ অনুশীলনী

১) চকাচকি গল্পে প্রেমের স্বরূপ যে ভাবে ফুটে উঠেছে আলোচনা কর।

২) কাহিনি বিস্তারের মাধ্যমে গল্পের মূল ব্যঞ্জনা নিজের ভাষায় ব্যাখ্যা কর।

৩) চরণদাস এম এল এ গল্পে রাজনৈতিক স্থূলতা গল্পকার যেভাবে চিত্রিত করেছেন তা আলোচনা কর।

১২.৪ গ্রন্থপঞ্জি

১) চৌধুরী, শ্রীভূদেব, - বাংলা সাহিত্যের ছোটগল্প ও গল্পকার, মর্ডাণ বুক এজেন্সি প্রাঃ লিঃ।

২) দত্ত, বীরেন্দ্র – বাংলা ছোটগল্প প্রসঙ্গ ও প্রকরণ(প্রথম খন্ড), পুস্তক বিপণি।

৩) বাংলা সাহিত্য পরিচয়, ড পার্থ চট্টোপাধ্যায়, তুলসী প্রকাশনী।

৪) সতীনাথ ভাদুড়ীর নির্বাচিত রচনা, বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড।

এককঃ–১৩ সতীনাথ ভাদুড়ীর নির্বাচিত গল্পের সংক্ষিপ্ত পরিচয় - ডাকাতের মা

বিন্যাসক্রম

১৩.১ ডাকাতের মা গল্প – গল্পের নিরিখে সতীনাথ ভাদুড়ীর গল্পকার প্রতিভার বৈচিত্র্য

১৩.২ অনুশীলনী

১৩.৩ গ্রন্থপঞ্জি

১৩.১ ডাকাতের মা গল্প – গল্পের নিরিখে সতীনাথ ভাদুড়ীর গল্পকার প্রতিভার বৈচিত্র্য

সতীনাথ ভাদুড়ীর অন্যতম বিখ্যাত গল্প ডাকাতের মা। এই গল্পে দেখানো হয়েছে মাতৃত্বের আবরণ যেমন সন্তানের জন্যভ আশীর্বাদের, আবার পরিবেশ পরিস্থিতির দায় নিজের কাঁধে তুলে নিতে গেলে সেখানে বিপত্তি আসতে পারে। প্রশ্ন এখানেই সৌখীন মা কেন কেবলমাত্র মাতৃ পরিচয়ে থাকল না, শেষমেশ সে ডাকাতের মায়ের পরিচয়ে গল্পের সমাপ্তি ঘটল। সেই ঘটনা পরম্পরার বিবরণ আমরা তুলে ধরবার চেষ্টা করব। সৌখী আজ পাঁচ বছর জেলে গেছে, প্রথম দুবছর সৌখীর দলের লোকেরা নিয়মিত টাকা পাঠাতো, তিন বছর থেকে টাকা পাঠায় না। সৌখীর বাপ কতবার জেল খেটেছে, সৌখীও এর আগে দুবার জেলে গেছে, সৌখীর বউ আর তার ছেলেকে বাপের বাড়ি পাঠিয়ে দিয়েছে সৌখীর মা, কেননা না খেতে পেয়ে ছেলে আর বউতা দিন দিন দুর্বল হয়ে পড়ছিল, বউ গয়লাবাড়ির মেয়ে, দুবেলা দুটুকু পাবে।

সৌখীর মার রাতে ঘুম আসতে চায় না। একবার সৌখী রাতদুপুরে এসে সাড়া না পেয়ে তার মাকে কি মারই না মেরেছিল। কিছু পরে দরজায় টোকা মারবার শব্দ শোনা গেল, ডাকাতের মাকে স্ব রকম কায়দা কানুন জানতে হয়, তাই নিয়ম মেনেই দশবার নিশবাস ফেলে দরজা খুলে দেখে সৌখী। বুড়ি আনন্দে ছেলেকে জড়িয়ে ধরে। ছেলেকে জিজ্ঞেস করে জানতে পারে-

লাটসাহেব জেল দেখতে গিয়েছিল। আমার কাজ দেখে খুশী হয়ে ছেড়ে দেবার হুকুম দিয়ে দিল। খুশী আর কি! হেড জমাদারদাহেবকে টাকা খাইয়েছিলুম। সে-ই সুপারিশ করে দিয়েছিল জেলরবাবুর কাছে। তাই বেশি রেশমিন পেয়ে গেলাম।'

এরপর বউ ছেলেকে খোঁজে বাড়ির মধ্যে। ছেলে পেটে থাকতেই সে জেলে যায়, তারপর মনে মনে ছোটছেলের ছবি জেলের মধ্যেই কল্পনা করেছে। সে মনে মনে ঠিক করেফেলেছে কালই যাবে শ্বশুরবাড়ি বউছেলেকে নিয়ে আসতে।

মায়ের ছেঁড়া কম্বল নিজে নিয়ে নতুন কম্বলখানা মাকে দেয়, নতুন কম্বলখানা গায়ে দিয়েও কিছুতেই ঘুম আসতে চায় না মায়ের, কাল সকালে ঘুম থেকে উঠে খাওয়াবে তাঁকে। কাছারির ঘড়িতে দুটো বাজল। মনে পড়ল পেশকার সাহেবের বাড়িতে রাজমিস্ত্রী লেগেছে। আজ মুড়ি বেঁচতে গিয়ে দেখেছে সে পড়ে যাওয়া পাঁচিলটা গাথা হছে। পাঁচিল পেরিয়ে বুড়ি পেশকার সাহেবের জলভরা ঘটি তুলে নিয়ে নিঃশব্দে চলে এলো। এদিকে সকাল সকাল লোটা নিয়ে হুলস্থূল পড়ে গেল পেশকার সাহেবের বাড়িতে, সকাল সকাল বেরোলেন বাসনের দোকানে নতুন ঘটি কিনতে, এটা সেটা দেখতে দেখতে দোকানদার তারই ঘটিখানা পেশকার সাহেবের কাছে জাহির করল। সংবাদে জানতে পারল সৌখীন মায়ের কাজ। মাতাদীন পেশকার দারোগা নিয়ে হাজির সৌখীর বাড়ি। তখন সৌখীর মা আলুর তরকারি চাপিয়েছে। সৌখী তখনও ঘুমুচ্ছে। একসঙ্গে দারোগা ও পেশকার সাহেবকে দেখে সৌখীর মার বুক ভয়ে কেঁপে উঠেছে। সঙ্গে আবার বাসনওয়ালাও রয়েছে। পাঁচ বছর আগে একবার ভোর রাতে তাদের বাড়ি খেরাও হয়েছিল তখন সৌখীর মার মাথা হেঁট হয়নি, কিন্তু আজ তার মুখ দেখানোর জায়গা নেই। ডাকাতি করা তার ছেলে স্বামীর হকের পেশা। ডাকাতি করতে গিয়ে ধরা

পড়লে তা গৌরবের। কিন্তু শেষে কিনা লোটা চুরি। লজ্জায় সৌখীর মা অভিযোগ অস্বীকার করতে পর্যন্ত ভুলে গিয়েছে। সৌখীর মা মাত্র চোদ্দ আনা পয়সার জন্য ঘটি চুরি করেছে। তাঁকে যদি একবারটি চাইতো, জেলের ঠিকাদারের কাছে নব্বই টাকা রোজগার করে এনেছে। এখনও সেই টাকা বাটুয়ায় আছে। মেয়েমানুষের আর আক্কেল কবে হবে। সৌখী এই কথা ভেবে নিজের মায়ের অপরাধ নিজের ঘাড়ে নিয়ে পুলিশের সঙ্গে চলে গেল। মা তখন ডুকরে ডুকরে কাঁদছে। না ছেলের জেল যাবার জন্যে নয়, কদুচোরের সামান্য একটা লোটা চুরির অপরাধের ডাকাতের মাথা সৌখীকে জেল যেতে হচ্ছে, এই অপমানে সৌখীর মা ভেঙে পড়েছে। শেষের চিত্রকল্প অসাধারণ – 'উনোনে আলুর তরকারির পোড়া গন্ধ সারা পাড়ায় ছড়িয়ে পড়েছে।'

১৩.১ অনুশীলনী

১) ডাকাতের মা গল্পে কাহিনি পরিচয় দাও।

২) ডাকাতের মা কেন শেষ পর্যন্ত নিজেকে ক্ষমা করতে পারেনি বিচার কর।

১৩.২ গ্রন্থপঞ্জি

১) চৌধুরী, শ্রীভূদেব, - বাংলা সাহিত্যের ছোটগল্প ও গল্পকার, মর্ডাণ বুক এজেন্সি প্রাঃ লিঃ।

২) দত্ত, বীরেন্দ্র – বাংলা ছোটগল্প প্রসঙ্গ ও প্রকরণ(প্রথম খন্ড), পুস্তক বিপণি।

৩) বাংলা সাহিত্য পরিচয়, ড পার্থ চট্টোপাধ্যায়, তুলসী প্রকাশনী।

৪) সতীনাথ ভাদুড়ীর নির্বাচিত রচনা, বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড।

একক:-১৪ সতীনাথ ভাদুড়ীর নির্বাচিত গল্পের সংক্ষিপ্ত পরিচয় - পত্রলেখায় বাবা, বৈয়াকরণ

বিন্যাস ক্রম

১৪.১ পত্রলেখার বাবা

১৪.২ বৈয়াকরণ

১৪.৩ অনুশীলনী

১৪.৪ গ্রন্থপঞ্জি

১৪.১ পত্রলেখার বাবা

দোলগোবিন্দবাবুর বাড়িতে আড্ডায় চিৎকার চেঁচামিচি নেই, যেন নীরবতা। না আছে পাশের বাড়ির নেপাল, মাধবাবু আর মদনবাবু। খবরের কাগজে মুখ গুঁজে কি যেন পড়ছে। রাস্তা দিয়ে অনুপ আর পত্রলেখা আসছে, নীলমণিবাবুর বাড়িতে গিয়েছিল, আটকৌড়ের অনুষ্ঠান ছিল।

এরপর সবর্জ্ঞ কথক জানাচ্ছেন –

"বাপের নাম দোলগোবিন্দ, মায়ের নাম খেঁদি, মেয়ের নাম হল কিনা পত্রলেখা।"

আসলে এই কথাটির মধ্যে লুকিয়ে আছে গল্পের প্রধান নামকরণ রহস্যটি। বেনামী চিঠি পাঠানো তার বহুদিনের অভ্যাস, নেশার মতোই এই কাজ তিনি করেন। স্ত্রী পুরুষ নির্বিচারে কত বেনামী চিঠি যে তিনি আজ পর্যন্ত লিখেছেন তার ইয়ত্তা নেই। তিনি নিজেকে বোঝাতে চেষ্টা করেন এই কাজ সমাজের কল্যাণার্থে করে থাকেন। কিন্তু মনে মনে জানেন কেন লেখেন। এর মধ্যে একটা অদ্ভুত আনন্দ পান। দুর্বার আকর্ষণ।

পরকুৎসা করবার বাঁ শোনবার রসটা মিষ্টি সন্দেহ নেই...এটাকে আড়াল থেকে খুনসুড়ি করে, মজা উপভোগ করা ভাবলে ভুল হবে। এ হচ্ছে ক্ষমতা সচেতন মেঘনাদের, মেঘের আড়াল থকে নিজের অস্ত্রের পরীক্ষা নিরীক্ষা। শিকারের উপর বেনামী চিঠির প্রতিক্রিয়ার কথাটা কল্পনা করেই সবচেয়ে বেশি আনন্দ। সেটা নিজের চোখে দেখতে পেলে তো কথাই নেই। এই ঘন রসের নেশা তাঁর একদিনে গড়ে ওঠেনি। ধাপে ধাপে এগিয়েছেন তিনি। প্রথম বয়সে স্কুলের পায়খানার দেওয়ালে লিহতেন। তারপর আরম্ভ করেছিলেন রাতদুপুরে শহরের দেওয়ালে ল্যাম্পপোস্টে কুৎসা ভরা প্ল্যাকার্ড আঁটা। কিন্তু ওসবের স্বাদ কিছুদিনের মধ্যে ফিকে মনে হয়েছিল। ওর রস প্রচারে; চটকদার কুৎসার কথাটা দশজন মিলে উপভোগ করে। কিন্তু বেনামী চিঠি দেবার আনন্দের জাত আলাদা; একা উপভোগ করবার অধিকারের আমেজ অনেক বেশি গভীর। তাই তিনি ক্রমে ওসব ছেড়ে এই পথ ধরেন। এ পথে বিপদ-আপদ কম। তার বেনামী চিঠি দেবার খবরাখবর বন্ধুদের মধ্যে কেউ জানে না। কারও সঙ্গে আলোচনা কোনদিনের জন্য করেননি। জানেন শুধু মাত্র তার স্ত্রী – তাও সবটা নয়, কিছু কিছু। যত লুকিয়েই নেশা কর না কেন, স্ত্রীর কাছে কোনো না কোনো সময় সেটা ধরা পড়ে, চাবি দেওয়া দেরাজের মধ্যে চিঠি লিখবার সরঞ্জাম, আর ডাকটিকিটের প্রাচুর্য দেখেই স্ত্রীর মতো বুদ্ধিমতী মহিলা হয়তো একটা মন গড়া মানে করে বসবে। তাই স্ত্রীকে জানিয়ে দলে টানতে হয়েছে। দরকার পড়েছিল মেয়েমানুষের হাতে লেখা বেনামী চিঠির। একবারও জিজ্ঞেস করেননি এই কাজে বিপদ আছে কিনা, মৃদু সম্মতি জানিয়ে পরে দেখা গেছে এ বিষয়ে তার আগ্রহ বেশি, স্বামীর দেওয়া ডিক্টেশন লিখেছিলেন নিখুঁত ভাবে। লেখা শেষ হলে রসিকতা করে বলেছিলেন, ‘পাড়ার মধ্যে হয়েছিল বিয়ে আমাদের। বরের চিঠিও কোনদিন পাইনি; বরকে চিঠি লেখবার সুযোগও কোনোদিন পাইনি। চিঠি লেখার পাটই আমার নেই। যাক, ফাঁকি দিয়ে সুযোগ পেয়ে গেলাম জীবনে প্রেমপত্র লিখবার।’

গল্পশেষে দেখা যায়, নীলমণিবাবুর উদ্দেশ্যে চিঠি লিখবার সময় ধূলো বানানে তিনি আটকে যান।

পরের ঘটনা পত্রলেখার একখানি লেখা চিঠি। তিনি হাতের লেখা দেখেই চিনতে পেরেছেন। পড়তে গিয়ে কেমন যেন বাঁধো বাঁধো ঠেকে নিজেকে। চিঠির নীচেকারো নামও নেই। চিঠি খানি তাড়াতাড়ি লেখা মনে হয় অনেক লেখা হয়েছে। একাধিক বার পরে সর্বশরীর রী রী করে ওঠে। রাগে মেয়েকে ডাকতে গিয়ে আর নাম মনে পড়ে না। নেপালের মন দিয়ে খবরের কাগজ পড়বার ব্যাপারটাই ছিল প্রথম সন্ধেহের। একথা সে এখন বুঝতে পারে। ওই বাঁদরটাই হয়তো পত্রলেখাকে বইয়ের মধ্যে রেখে চিঠি পাঠানোর কৌশল শিখিইয়েছে। গল্পের শেষে দেখা যায় পত্রলেখার বাবা তাঁর দেরাজের থেকে একটা পেন হোল্ডার বার করে দেখেন নিব হীন পেনে বাঁ হাত দিয়ে কালির মধ্যে হাত ডুবিয়ে ডুবিয়ে একখানা চিঠি লিখছেন। জীবনে স্ত্রীর কাছে তাঁর এই প্রথম লেখা চিঠি।

১৪.২ বৈয়াকরণ

জীবন কোনো ব্যকরণের নিয়মের চাল নয়, নয় কোন প্রথাবদ্ধ গতানুগতিকতার ধারাবাহিক আঙ্গিক। তাই সেখানে হিসাবের চাল, কথা কঠোরতা চলে না। জীবনের কোনো নির্দিষ্ট বিষয়ে সর্বজ্ঞ পান্ডিত্য থাকে না, থাকতে পারে না, কেননা বিষয় সাধারণ ধারণার অতিরিক্ত স্তরে বিষয়াতীতের দুনিয়ায় জ্ঞানীর দৃষ্টিভঙ্গী উন্মোচন করে নতুন নতুন করে, নতুন ভাবালোকে। সেইকারণে একদা আত্মগৌরবে ভরপুর তুরন্ত স্যারকেও ব্ল্যাকবোর্ড মুছে ফেলে ছলনায় নিজের ভুল ঢাকতে বলতে হয় ‘এসব তোমাদের দরকার নেই, বুঝলে। বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় এসব প্রশ্ন কখনও আসে না।’ কিন্তু মন জানে তিনি নিজের সীমাবদ্ধতার কাছে ধরা পড়ে গেছেন। নিজের অজ্ঞানতা নিজের কাছে ধরা পরতেই তিনি রেগে জান। যদিও পন্ডিতজী নিজের ক্লাস ও পড়ানোর প্রতি আনুগত্য সম্পর্কে এক চুলও খামতি রাখতে চান না। নিষ্ঠাবান ব্রাম্ভণ – পূজা আহ্নিক করেন- শুদ্ধাচারে থাকেন –ছেলেদের স্কুলে যখন চাকরি করতেন, তখন তেওয়ারী চাপরাসীটা জল তুলে এনে দিত। মিথিলার ক্ষোত্রীয় ব্রাম্ভণ, জেলা স্কুলের চাকরি থেকে পেননেস নেবার পর মেয়েস্কুলে চাকরি নিয়েছেন। আজ মাস দুয়েক হল পন্ডিতজীর মন ভাল যাচ্ছে না। একটি মুমূর্ষু মহিমার মুখ থেকে নির্গত

একটি বাক্য তাঁর কর্ণগোচর হবার পর তাঁকে পীড়া দিচ্ছ। স্কুলে আছে এক মৌলবী সাহেব। তিনি উর্দু পড়ান। মেয়েদের সংখ্যা কম উর্দু পড়ায়। মৌলবী সাহেব খোঁটা দিতে ছাড়েন – 'আপনাকে আর বক বলি কী করে। বকের পালকের মতো আপনার সাদা চুল আর দাড়ি, আবার ভ্রমরের মতো কালো হয়ে উঠেছে। আপনি বক কেন হতে যাবেন – আপনি হলেন ভ্রমর।'

পন্ডিত মশাই তার উত্তরে বলেন – 'হাতি চলে বাজারে, কুকুর ডাকে হাজারে।'

মৌলবী কথা শেষ করতে না দিয়ে বললেন – 'আপনি চুল সাদা রেখেছেন বলে বলছেন। না? বগলা-ভগত (বকধার্মিক) দেখতে সাদাই হয়।'

বহুকাল এই মৌলবীর সঙ্গে কাজ করেছেন জেলা স্কুলে। কিন্তু তাঁর পা দোলানো এত খারাপ এর আগে কখনও লাগে নি। কিন্তু এই খোশমেজাজী লোক কিনা শেষমেষ বললেন বকধার্মিক। সৎ ও ধার্মিক লোক বলে পাড়ায় তাঁর একটা খ্যাতি আছে। তিনি নেপালের মহাকালী দর্শন করে এসেছেন। কলকাতার কালী দর্শন করেছেন। কামরূপ কামাখ্যায় তিনি সস্ত্রীক তীর্থ করে এসেছেন। নিষ্ঠা ও সদাচারের মধ্যে কোথাও কোন ফাঁকি ছিল না।তিনি যা নন তা দেখাতে চেষ্টা করেননি। নিজের নাম সই করেন – তুরন্তলাল মিশ্র, ব্যাকরণতীর্থ। বাড়ির চিঠি পর্যন্ত।

প্রথমে যখন স্কুলে জয়েন্ট করেন তখন ভাবতেন ইংরেজী না জানায় ক্লাসে ছেলেরা উপেক্ষা করে, কতকটা এইজন্য আর কতকটা ক্লাসে পড়ানোর সুবিধার জন্য, প্রাণপণ চেষ্টা করে সামান্য ইংরেজী শিখেছিলেন। এর ফলে ছেলেরা তাঁর পিছন লাগত। ক্লাসের নানা ঘটনায় পন্ডিতজীর পুরোনো স্কুল, বাড়ির ঘটনা, বিশেষত তাঁর বাড়ি কিছু দিনের জন্য বেড়াতে আসা শালীর কাপড়ে আগুন লেগে পুড়ে যাওয়ার ঘটনা কথা মনে পড়ে যায়।

হঠাৎ একটি চিঠি আসে। তাঁর শালা আবার বিয়ে করবে তারই নেমতন্ন। এই চিঠিখানার কথা বেমালুম চেপে যাবার পরিকল্পনা করেন। পোস্ট অফিসে কত চিঠি এমনি হারিয়ে যায়। হয়তো জীবনে এই প্রথম বার তিনি মিথ্যাচার করবেন।

১৪.৩ অনুশীলনী

১) পত্রলেখার বাবা গল্পের নামকরণের সার্থকতা আলোচনা কর।

২) বৈয়াকরণ গল্পের প্রেক্ষিতে পন্ডিতজীর চরিত্র ও মোহভঙ্গের চিত্র তুলে ধর।

১৪.৪ গ্রন্থপঞ্জি

১) চৌধুরী, শ্রীভূদেব, - বাংলা সাহিত্যের ছোটগল্প ও গল্পকার, মর্ডাণ বুক এজেন্সি প্রাঃ লিঃ।

২) দত্ত, বীরেন্দ্র – বাংলা ছোটগল্প প্রসঙ্গ ও প্রকরণ(প্রথম খন্ড), পুস্তক বিপণি।

৩) বাংলা সাহিত্য পরিচয়, ড পার্থ চট্টোপাধ্যায়, তুলসী প্রকাশনী।

৪) সতীনাথ ভাদুড়ীর নির্বাচিত রচনা, বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড।

উপসংহার

প্রান্ত জীবন চর্চায় বিশ্বাসী এই নিরাভরণ মানুষটি সারা জীবনের অভিজ্ঞতা ব্যক্ত করেছেন তাঁর সাহিত্যসৃজনে। সেই অভিজ্ঞতার আধার হয়েছিল তাঁর এই আঞ্চলিক মানসিকতার গল্পগুলি ও সাহিত্যসৃষ্টিগুলি। কিন্তু যেখানে তাঁর সৃষ্টি এই মানসিকতা ছাড়িয়ে নির্বিশেষ হয়ে ঊঠতে পেরেছে তাঁর সতর্কতা, আত্মসমালোচনা, মার্জিত এবং পর্যবেক্ষণের নিপুণতায়, সেখানে তিনি কালোর্ত্তীণ রচনার স্রষ্টা। সতীনাথ তা বলে শরৎচন্দ্র নন, তারাশঙ্কর, বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, মানিক বন্দ্যোপাধায় এমন কি সরোজকুমার রায় চৌধুরীও নন। তাঁর নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গীই তাঁকে সময়ের ভিন্ন অথচ সমকালীন হয়ে ধরা দেবার এক অদ্ভুত শৈল্পীক গুণকে জন্ম দিয়েছিল, করে তুলে ছিল সুদূরপ্রসারী চেতনাপ্রসারী একজন সাহিত্যবোদ্ধা।